POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া।

(মায়েদা: ৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 46

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

18 নভেম্বর , 2021 ● 12 রবিউল সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

বারিরার জন্য সদকা, কিন্তু আমাদের জন্য উপহার

১৪৮০) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) -এর কাছে মাংস নিয়ে আসা হয় যা বারিরা (রা.) কে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তার জন্য সদকা হলেও আমার জন্য এটি উপহার।'

নিপীড়িতের অভিশাপ এড়িয়ে চল, কেননা তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

১৪৯৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মাআজ বিন হাবাল (রা.)কে যখন ইয়েমেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি এমন জাতির দিকে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। তাদের কাছে পোঁছে তাদের কাছ থেকে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করো যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদেরকে বলে,'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দিন ও রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ধার্য করেছেন। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়,তবে তাদেরকে বলো, 'আল্লাহ্ তাদের জন্য সদকাও (যাকাত প্রদান) বিধিবদ্ধ করেছেন যা তাদের ধনবানদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং অভাবীদেরকে দেওয়া হবে। যদি তারা তোমার এই কথা মেনে নেয়, তবে একথা মাথায় রেখো! তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদগুলি নিও না এবং নিপীড়িতের অভিশাপ এড়িয়ে চল, কেননা তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৫ অক্টোবর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

আমি সত্যি করে বলছি, সন্দেহপ্রবণতা ভীষণ মন্দ বিষয়, এটি মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় এবং সততা ও বিশ্বস্ততার পথ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে, বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে দেয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ভালভাবে স্মরণ রেখো যে যাবতীয় পাপাচার ও দুর্বৃত্তির উৎস হল সন্দেহ পোষণ করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এর থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ মৌলভী যদি আমাকে সন্দেহ না করত এবং সততা এবং ধৈর্যের সাথে আমার কথা শুনত, আমার বইগুলি পড়ত আর আমার কাছে থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করত, তবে তারা আমার উপর সেই সব অভিযোগ আরোপ করত না, যা তারা করে থাকে। কিন্তু যখন তারা খোদা তা'লার আদেশকে অবজ্ঞাভরে অমান্য করল, এর পরিণামে তারা আমাকে সন্দেহ করল, আমার জামাতকে সন্দেহ করল এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে শুরু করল, এমনকি অনেকে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আমার জামাতকে নাস্তিকদের দল বলে অভিহিত করল এবং অপবাদ দিল যে এরা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা যদি এই সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকত, তবে সেই অভিশাপের আওতায় আসত না, তারা এর থেকে রক্ষা পেত। আমি সত্যি করে বলছি, সন্দেহপ্রবণতা ভীষণ মন্দ বিষয়, যা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় এবং সততা ও বিশ্বস্ততার পথ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে, বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে দেয়। সত্যবাদীর পরাকাষ্ঠা অর্জনের জন্য মানুষের সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারো সম্পর্কে যদি কোন অযথা সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে অধিকহারে ইসতেগফার পাঠ করা উচিত এবং খোদা তা'লার নিকট দোয়া করা উচিত যাতে এই পাপ এবং এর অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা পায় যা সন্দেহপ্রবণতার কারণে উদ্ভূত হয়। এটিকে কখনোই সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। এটি এক ভয়াবহ ব্যাধি যাতে মানুষ দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়।

বস্তুত সন্দেহপ্রবণতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই কথাই বলবেন যে, 'তোমাদের অপরাধ হল তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছ। কিছু মানুষ এমন প্রকৃতিরও আছে যারা মনে করে যে আল্লাহ তা'লা অপরাধীদের ক্ষমা করবেন এবং পুণ্যবানদের শাস্তি দিবেন। এটিও খোদা তা'লার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা। কেননা এটি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, এবং কুরআন শরীফে বর্ণিত পুণ্যকর্ম ও এর জন্য নির্ধারিত পরিণামকে অস্বীকার করার এবং অবান্তর হিসেবে গণ্য করার নামান্তর। অতএব, স্মরণ রেখো, সন্দেহপ্রবণতার চূড়ান্ত পরিণাম হল জাহান্নাম। এই ব্যাধিটিকে তুচ্ছ মনে করো না। সন্দেহপ্রবণতা থেকে নিরাশা, নিরাশা থেকে অপরাধ এবং অপরাধ থেকে জাহান্নাম জোটে। এটি সততার মূল কর্তনকারী উপাদান। অতএব, তোমরা এর থেকে বিরত থাক এবং (সিদ্দীক) সত্যবাদীর পরাকাষ্ঠা অর্জনের জন্য দোয়া কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৬)

কুরআন করীমের যাবতীয় শক্তির নির্যাস রয়েছে। অর্থাৎ সাতটি সংক্ষিপ্ত আয়াত, কিন্তু কার্যত সমগ্র কুরআনের অর্থ এর মধ্যে সমাবিষ্ট হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সুরা হিজর-এর ৮৮ নং আয়াত

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

আমরা তোমাদেরকে সূরা ফাতিহার ন্যায় নেয়ামত দান করেছি, যা সাতটি আয়াত সংবলিত, এবং পুণঃ পুণঃ পাঠযোগ্য। অভিধান পুস্তকে 'মাসানি'-র অর্থ বলা হয়েছে কোন বস্তুর শক্তি ও ক্ষমতা। এই রূপে সূরা ফাতিহার 'মাসানি' নামকরণের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে কুরআন করীমের যাবতীয় শক্তির নির্যাস রয়েছে। অর্থাৎ সাতটি সংক্ষিপ্ত আয়াত, কিন্তু কার্যত সমগ্র কুরআনের অর্থ এর মধ্যে সমাবিষ্ট হয়েছে।

কুরআনে আযীম-এর অর্থ অবশিষ্ট কুরআনও হতে পারে এবং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে সূরা ফাতিহাও দান করা হয়েছে যা কার্যত সমগ্র কুরআন এবং বিস্তারিত কুরআনও দেওয়া হয়েছে। আর এর অর্থ সূরা ফাতিহাও হতে পারে। এমতাবস্থায় এই অর্থও হবে যে সূরা ফাতিহা কুরআন করীমের একটি বড় প্রধান অংশ, আর কুরআনের অর্থ সমগ্র কুরআন নয়,বরং কুরআনের অংশকে বোঝানো হয়েছে। আর কোনও একটি অংশকে বর্ণনা করতে সমগ্র সত্তার জন্য প্রযোজ্য শব্দের ব্যবহার একটি সাধারণ বাগধারা হিসেবে প্রচলিত। যেমন- সাধারণত লোকে বলে কুরআন শোনাও। এর অর্থ সমগ্র কুরআন শোনানোকে বোঝায় না, বরং এর কিছু অংশ পাঠ করাকে বোঝানো হয়। কাজেই 'আল কুরআনুল আযীম' শব্দ সূরা ফাতিহা সম্পর্কে এ বিষয়ের

শেষাংশ শেষের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: সফরকালে রমযানের রোযা থেকে অব্যহতি পাওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য করার জন্য দিক-নির্দেশনা চাওয়া হলে হুযুর আনোয়ার (আই.) ১১ই জুন, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আপনার চিঠিতে বর্ণিত দুই প্রকারের বক্তব্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উভয়েই কুরআন করীমের স্পষ্ট নির্দেশের আলোকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসাফির ও অসুস্থদের রোযা রাখা উচিত নয়। কেউ যদি অসুস্থ অবস্থায় কিম্বা সফরকালে রোযা রাখে, তবে সে খোদা তা'লা স্পষ্ট আদেশকে অমান্য করে।

যতদূর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এই নির্দেশটির সম্পর্ক- 'রোযায় সফর করা যায়, কিন্তু সফরে রোযা করা যায় না।'-যদি এই পুরো খুতবাটি পড়া হয় তাহলে স্পষ্ট হবে যে তিনি এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় বোঝাচ্ছেন যে, যে সফর যথারীতি প্রস্তুতি নিয়ে, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুছিয়ে যাত্রার উদ্দেশ্যে করা হয়, সেই সফর ছোট হলেও শরিয়ত তাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। কিন্তু যে যাত্রা নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে সফর হিসেবে গণ্য হবে না, এতে রোযা রাখতে হবে। এই কারণে সফরে রোযা রাখার বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বক্তব্যগুলিও এই দৃষ্টিভঙ্গিরই সমর্থন করে।

প্রশ্ন: মেয়েরা কি নিজেদের নিকাহতে নিজেরাই উপস্থিত থেকে 'ইজাব ও কবুল' করতে পারে? নিকাহর ঘোষণার সময় হক মোহরের কথা উল্লেখ করা কি আবশ্যক?

২০১৯ সালের ২২ শে জুলাই তারিখের চিঠিতে হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে লেখেন- আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে যেখানে মসুলমান পুরুষদেরকে মোমেন মহিলাদেরকে এবং মুসলমান মহিলাদেরকে মোমেন পুরুষদের সঙ্গে নিকাহ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে- 'লা তানকেহুল মুশরেকাত'। অর্থাৎ তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিবাহ করবে না। আর মহিলাদের জন্য বলা হয়েছে- 'ওয়ালা তুনকেহুল মুশরিকিন।' অর্থাৎ=(তোমরা মেয়েদের) বিয়ে মুশরিক পুরুষদের সঙ্গে দিবে না।

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা মহিলাদের অভিভাবকদের উপর তাদের নিকাহর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। এই কারণে নিকাহর ঘোষণা সময় মেয়ের পক্ষ থেকে তার অভিভাবক 'ইজাব ও কবুল' করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-

'মহিলারা নিজে থেকে নিকাহ ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখে না। যেমনটি তারা নিজে থেকে নিকাহ করার ক্ষমতা রাখে না। বরং বিচারকের মাধ্যমে নিকাহ বিচ্ছেদ করতে পারে, যেভাবে ওলী বা অভিভাবকের মাধ্যমে নিকাহ করতে পারে।"

(আরিয়া ধর্ম, পৃ: ৩২, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৭)

কাজেই নিকাহর ঘোষণায় 'ইজাব ও কবুল'-এর সময় মেয়ের পক্ষ থেকে ওলী বা অভিভাবক এই দায়িত্ব পালন করবে। আর এটিই জামাতের প্রথা।

আর যতদূর নিকাহ ঘোষণার সমময় হকমোহর ঘোষণা করার বিষয়টি রয়েছে,- এটি জরুরী নয়, কেননা কুরআন করীমের আদেশ অনুসারে হক মোহর নির্ধারণ ছাড়াও নিকাহ হতে পারে। যেমনটি বলা হয়েছে-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (سورة البقرة:

(সুরা বাকারা: ২৩৭)

প্রশ্ন:২০২০ সালের ২৯ শে আগস্ট হুযুর আনোয়ার সুইডেনের মজলিসে আমলার সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের একদিন পূর্বে ইসলাম বিরোধী সংগঠনের পক্ষ থেকে সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর নিন্দা এবং এর কারণে একজন আহমদীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হলে হুযুর আনোয়ার বলেন-শুনেছি এখানে গত রাত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, এর প্রভাব কি আপনাদের এলাকায় পড়ে নি?

সুইডেনের আমীর সাহেব উত্তর দেন যে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কিন্তু এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। হুযুর আনোয়ার বলেন-

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়ে আছে, তা আপনাদেরকেই দূর করতে হবে। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কুরআন পুড়িয়ে ফেলব বলে হুঙ্কার দিচ্ছে,তাকে পুলিশ এমনটি করার অনুমতি না দিলেও একথাও বলেছে যে তার আবেদন করার অধিকার আছে। সে আবেদন করতে পারে।এরপরেই তাদের কিছু অনুসারী বা সংগঠনের সদস্যরা পার্কে গিয়ে রাত্রিবেলা কুরআন করীম পুড়িয়েও দিয়েছে। এটা কেন হচ্ছে? কারণ তারা জানে না যে ইসলামের শিক্ষা কি? কুরআন করীমের শিক্ষা কি? আর এজন্য যে মুসলমানদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ একথাই প্রকাশ করছে যে কুরআন করীমেই হয়তো এই সব শিক্ষা রয়েছে। তারা যুদ্ধ করার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতটি ধরে, কিন্তু এই আয়াতের অন্যান্য যে নির্দেশ রয়েছে, যে প্রেক্ষাপট রয়েছে সে সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়। এই বিষয়গুলি তাদের জানা উচিত। এই সব কথা মাথা রেখে আপনাদের তবলীগের পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রশ্ন: ভার্চুয়াল সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই আরও একজন প্রশ্ন করেন যে, কোরোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে?

উত্তর: হোয়াটস আপ ও সোশাল মিডিয়ার মত অন লাইন প্লাটফর্মে তবলীগ অনেক বেশি শুরু হয়েছে। সেখানে দেখুন যে লোকেদের কি কি প্রশ্ন রয়েছে। কি কি সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন সাইটস রয়েছে, সেখানে মানুষদের বলুন যে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নাস্তিক না হয়ে খোদাকে ত্যাগ না করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকতে হবে, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাঁকে চিনতে হবে। একথা মনে করবেন না যে খোদা তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করেন না, বা খোদা তা'লার অস্তিত্ব নেই বা এই জগতই সব কিছু। পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এই কাজ করতে হবে। কেননা এর পর যে সংকট আসবে, এই মহামারির পর পৃথিবীর অর্থনীতির মধ্যে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হবে তখন যে সংকট আসবে তা হল মানুষ বিভিন্ন দেশ অপরের সম্পদ দখল করার চেষ্টা করবে, আর এর ফলে যুদ্ধ হবে, যার জন্য জোট তৈরী হয়, আর এই জোট ইতিমধ্যেই তৈরী হতে শুরু করেছে। এর থেকে রক্ষা পেতে একটাই পথ। খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন কর। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সারা জগতের মানুষের সম্পর্ক রয়েছে-এই মিডিয়াকে আপনারাও কাজে লাগান। আর সেই মাধ্যমটিকে আপনারাও কাজে লাগান যা সারা পৃথিবী কাজে লাগাচ্ছে। আমার ধারণা,আজকের যে সব আলোচনা হল, সেগুলিকেই বাস্তবায়িত করুন। আর যে কয়েকটি জরুরী কথা ছিল তা আমি বলে দিয়েছি। অর্থাৎ নাশনাল আমেলার সদস্যদের দায়িত্বাবলী কি আর আমেলা সদস্যদের সঙ্গে কথাগুলি আমি বললাম, সেই একই কথা বিভিন্ন মজলিসের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদেরকে বলছি। তাদেরকেও একথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই মত নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে। যদি তৃণমূল স্তরে সব কাজ হতে শুরু করলে এবং আপনাদের মজলিসের প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারী নিজের নিজের কাজ করে, নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করে, তবে ন্যাশনাল আমেলার কাজ সহজ হয়ে যায়। আর সেই উদ্দেশ্যই পূরণকারী হয় যাদের জন্য তাদেরকে পদাধিকারী বানানো হয়েছে। আর এভাবে আপনারা যুগ খলীফার সাহায্যকারীও হয়ে ওঠেন। আর জামাতের সেবার কাজও সঠিকভাবে সম্পন্নকারী হন। আর এর ফলে খোদার দৃষ্টিতেও আপনাদের খিদমত গৃহীত হয়। কিন্তু যদি কেবল পদ কাছে রেখে দেওয়া হয়,কাজ না করা হয়, নিজের অসৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়, দোয়ার প্রতি মনোযোগ না থাকে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা না থাকে, কেন্দ্রীয় বিভাগ এবং অংগসংগঠনগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিত না থাকে, তবে এমন পদাধিকারীদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। আর আপনারা আমার সঙ্গে কিম্বা জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারেন, কিন্তু খোদা তা'লার সঙ্গে এমনটি করা সম্ভব নয়। তাই সব সময় স্মরণ রাখবেন, প্রত্যেকটি কাজ করার সময় স্মরণ রাখবেন যে, খোদ তা'লা আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথা দেখছেন ও শুনছেন। তাই আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ্ তা'লার কারণে কাজ করতে হবে। এর জন্য নিজেদের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি এবং যোগ্যতা কাজে লাগাতে হবে, যাতে জামাতের সঠিক ও সক্রিয় সদস্য হতে পারেন এবং সঠিকভাবে জামাতের সেবাও করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের রক্ষক ও সহায় হোন।

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে চিঠিতে লেখেন-'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি তিন তালাক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তৃতীয় তালাকের পর মীমাংসার পথ কিভাবে বের করা যাবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ২২ শে জুলাই তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে বলেন-

কুরআন করীমের আদেশ হল 'আততালাকু মাররাতান' অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যার অর্থ এমন তালাক যেখানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ রয়েছে। আর তা কেবল দুই বার সম্ভব। এরপর বলা হয়েছে 'এমন দুই তালাকের পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার আর কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

(ক্রমশ...)

জুমআর খুতবা

‘খলীফাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় নি যার কারণে তাঁরা ভয়ভীত হয়েছেন, আর যদিও ভীতির অবস্থা এসেও থাকে তবে তা আল্লাহ্ শান্তিতে পরিবর্তিত করেছেন।’

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত উমর (রা.) এর শাহাদতের ঘটনা এবং শাহাদত পরবর্তী ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৫ অক্টোবর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৫ ইখা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণনা করার মতো আরো কিছু কথা রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর যে রেওয়ায়েতটি শোনানো হয়েছিল তা থেকে এটি বুঝা যায় যে, হযরত উমর (রা.)'র ওপর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ফজরের নামায পড়ে নেয়া হয়েছিল আর হযরত উমর (রা.) তখন মসজিদেই ছিলেন। যেখানে কিনা অন্যান্য রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উমর (রা.)-কে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় আর নামায পরে আদায় করা হয়। যেমনটি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হাজর এই রেওয়ায়েতের নীচে অপর একটি রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন হযরত উমর (রা.)'র অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে থাকে আর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন আমি মানুষের সাহায্য নিয়ে তাঁকে ঘরে পৌঁছে দেই। প্রভাতের আলো পরিস্কার ভাবে ফুঠে উঠা পর্যন্ত তিনি অচেতন ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, মানুষ কি নামায পড়ে নিয়েছে? তখন আমি নিবেদন করি, জ্বী, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তার ইসলাম ইসলাম নয় যে নামায পরিত্যাগ করেছে। এরপর তিনি ওযু করেন এবং নামায পড়েন।

(ফাতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬৩)

এছাড়া তাবাকাতে কুবরাতেও এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-কে তুলে বাড়িতে পৌঁছানো হয় আর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) নামায পড়ান। সেইসাথে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট দু'টি সূরা 'আল আসর' এবং إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ পাঠ করেন। অন্যত্র 'আল আসর' এবং وَالْعَصْرِ اور قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ার উল্লেখ রয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬৬)

হযরত উমর (রা.)'র ঘাতকের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাবাকাতে কুবরাতে লেখা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)'র ওপর আক্রমণ হলে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)-কে বলেন, যাও এবং খোঁজ নাও যে, কে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বের হই এবং ঘরের দরজা খুললে মানুষকে সমবেত দেখতে পাই, যারা হযরত উমর (রা.)'র অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আমীরুল মু'মিনীনকে খঞ্জরাঘাত করেছে? তারা বলে, আল্লাহ্র শত্রু আবু লুলু তাঁকে খঞ্জর মেরেছে, যে মুগীরা বিন শো'বা-র ক্রীতদাস। সে আরও লোককে আহত করেছে, কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন সেই একই খঞ্জর দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬৩)

হযরত উমর (রা.)'র শাহাদত কি কোন ষড়যন্ত্রের ফলাফল ছিল নাকি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল- এ সম্পর্কে পরবতী কালের কতিপয় ঐতিহাসিক এটিও লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের কারণ কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, বরং এটি এক ষড়যন্ত্র ছিল। যাহোক আমরা দেখি যে, তাদের মতামত হলো, হযরত উমর (রা.)'র মতো বীর খলীফাকে যেভাবে শহীদ করা হয়েছে, সাধারণত আমরা দেখি যে, ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ শাহাদতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করার পর নীরব হয়ে যান। এতে এই ধারণা জন্মে যে, আবু লুলু ফিরোয এক সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধবশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। কিন্তু বর্তমান কালের কতিপয় ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি নিছক এক ব্যক্তির ক্রোধের কারণে ঘটিত প্রতিশোধমূলক কাজ হতে পারে না, বরং এটি এক ষড়যন্ত্র ছিল আর রীতিমতো পূর্বপরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্রের অধীনে হযরত উমর (রা.)'কে হত্যা করা হয়েছিল। আর প্রসিদ্ধ ইরানী সেনাপতি হুরমুযান, যে কিনা তখন বাহ্যত মুসলমান হয়ে মদীনায় বসবাস করছিল, সে-ও এই ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিল। বর্তমান কালের এসব লেখকরা প্রাচীন ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, এটি যে একটি ষড়যন্ত্র ছিল, এমর্মে তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ এই হত্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি?

যদিও ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-তে কেবল এতটুকু পাওয়া যায় যে, সন্দেহ করা হয়, হযরত উমর (রা.)'র হত্যার পেছনে হুরমুযান এবং জুফাইনার হাত ছিল।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৪)

অতএব, এই সন্দেহের ভিত্তিতেই হযরত উমর (রা.)'র জীবনীকার বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে এটিকে রীতিমতো এক ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন।

এই লেখকদের মধ্য থেকেই একজন মুহাম্মদ রেযা সাহেব নিজ পুস্তক 'সীরাত উমর ফারুক'-এ লিখেন, হযরত উমর (রা.) কোন প্রাপ্তবয়স্ক যুদ্ধবন্দীকে মদীনায় আসার অনুমতি প্রদান করতেন না। এমনকি কূফার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শো'বা, তাঁর নামে একটি পত্র লিখেন যে, তার কাছে একজন ক্রীতদাস রয়েছে যে খুবই কুশলী আর তিনি তাকে মদীনায় নিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা.) বলেন, সে অনেক কাজ জানেযাতে মানুষের কল্যাণ হবে। সে কামার, কারুকার্যে দক্ষ, কাঠমিস্ত্রির কাজও জানে। হযরত উমর (রা.) হযরত মুগীরার নামে পত্র লিখেন এবং তিনি তাকে মদীনায় প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত মুগীরা তার জন্য মাসিক একশত দিরহাম কর নির্ধারণ করেন। সে হযরত উমর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, তার ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন কোন কাজ ভালোভাবে করতে পার? সে তাঁকে সে সব কাজের কথা বলে যেগুলোতে সে খুবই দক্ষ ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার কাজের দক্ষতার নিরিখে তোমার কর খুব একটা বেশি নয়। সে তখন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। স্বল্পকাল পর একদিন সেই একই ক্রীতদাস হযরত উমর (রা.)'র পাশ দিয়ে গেলে তিনি তাকে ডেকে বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তুমি বায়ুচালিত চাক্কি খুব ভালো বানাতে পার। সেই ক্রীতদাস ক্রোধ এবং ঘৃণার সাথে হয রত উমর(রা.)'র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং বলে, আমি আপনার জন্য এমন এক চাক্কি বানাব যে, মানুষ তা সম্পর্কে বলাবলি করে বেড়াবে। সেই ক্রীতদাস যখন ফিরে যায় তখন তিনি (রা.) তাঁর সাথে থাকা সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে

বলেন, এই ক্রীতদাস এইমাত্র আমাকে হুমকি দিয়েছে। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবু লুলু নিজ চাদরে লুকিয়ে রাখা দু 'ধারী চাকু দ্বারা হযরত উমর(রা.)'র ওপর আক্রমণ করে যার বাট তার হাতে ছিল, যেমনটি শাহাদতের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। তার একটি আঘাত নাভির নীচে লেগেছিল। একদিক থেকে হযরত উমর (রা.)'র প্রতি আবু লুলু'র বিদ্বেষ এবং ঘৃণাও ছিল, কেননা আরবরা তার অঞ্চল জয় করে নিয়েছিল এবং তাকে যুদ্ধবন্দি বানিয়েছিল আর তার বাদশাহ্‌কে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। সে যখনই যুদ্ধবন্দি কোন ছোট্ট শিশুকে দেখতো, তখন তাদের কাছে গিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলাতো এবং কেঁদে কেঁদে বলতো, আরবরা আমার প্রিয়দের হত্যা করেছে। যখন আবু লুলু হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করার দৃঢ় সংকল্প করে, তখন সে খুব যত্নের সাথে দু 'ধারী খঞ্জর বানায়, সেটিকে ধার দেয়, এরপর সেটিকে বিষাক্ত করে, অতঃপর তা নিয়ে হুরমুযান -এর কাছে যায় এবং বলে, এই খঞ্জর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বলে, আমার ধারণা হলো, তুমি এর মাধ্যমে যার ওপরই আক্রমণ করবে, তাকে হত্যা করবে। হুরমুযান পারস্যবাসীদের সেনাপ্রধানদের একজন ছিল। মুসলমানরা তাকে তুসতার নামক স্থানে বন্দি করেছিল এবং মদীনায় প্রেরণ করেছিল। সে যখন হযরত উমর (রা.)-কে দেখে তখন জিজ্ঞেস করে, তাঁর দেহরক্ষী দারোয়ান কোথায়?- যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম বলেন, তাঁর কোন দেহরক্ষী নেই, কোন দারোয়ান নেই, কোন সেক্রেটারী নেই, কোন দরবারও নেই। তখন সে বলে, তাঁর তো নবী হওয়া উচিত। যাহোক, এরপর সে মুসলমান হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.) তার ভাতা দু' হাজার (দেরহাম) নির্ধারণ করেন এবং তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দেন।

তাবাকাত ইবনে সা'দ পুস্তকে নাফে'র বরাতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান সেই ছুরি দেখেছিলেন যার মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি গতকাল এই ছুরিটি হুরমুযান ও জুফাইনার কাছে দেখেছিলাম, তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞস করি যে, তোমরা এই ছুরি দিয়ে কি কর? তখন তারা উভয়ে বলে, আমরা এটি দিয়ে মাংস কাটি, কেননা আমরা মাংস স্পর্শ করি না। এ কথা শুনে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই ছুরিটি তাদের দু 'জনের কাছে দেখেছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতএব, হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর নিজ তরবারি হাতে তুলে নেন এবং উভয়ের কাছে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। হযরত উসমান (রা.) হযরত উবায়দুল্লাহ্‌কে ডেকে পাঠান। যখন তিনি (অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্) তাঁর (অর্থাৎ হযরত উসমানের) কাছে আসেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, উক্ত দুই ব্যক্তিকে হত্যা করতে কোন বিষয়টি আপনাকে প্ররোচিত করেছে, যখন কিনা তারা দু 'জনই আমাদের নিরাপত্তায় ছিল? এ কথা শুনতেই হযরত উবায়দুল্লাহ্, হযরত উসমান (রা.)-কে ধরে মাটিতে ফেলে দেন, এমনকি লোকজন এগিয়ে আসে এবং তারা হযরত উসমান(রা.)-কে, হযরত উবায়দুল্লাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা করে। যখন হযরত উসমান (রা.) তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি অর্থাৎ হযরত উবায়দুল্লাহ্ তরবারি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু হযরত অব্দুর রহমান (রা.) তাকে কঠোরভাবে বলেন যে, তুমি এটি (তরবারি) নামিয়ে রাখ, তখন তিনি তরবারি নামিয়ে রাখেন।

এ রেওয়ায়েতটি অর্থাৎ, হযরত উসমান (রা.)-কে ভূপাতিত করাসংক্রান্ত ঘটনা কতটুকু সঠিক তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)'র ঘাতক আবু লুলু'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানে জুফাইনা এবং হুরমুযান-ও তার সাথে ছিল আর তারা ফিসফিস করে কথা বলছিল। আমি আচমকা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা দৌড়ে পালাতে আরম্ভ করে আর একটি ছুরি তাদের মাঝে পড়ে যায়। এর দু 'টি ফলা ছিল, আর এর বাট ছিল মাঝখানে। একটু দেখ, যে ছুরি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে সেটি কেমন ছিল? অতএব তারা দেখলো যে, সেই ছুরিটি হুবহু তেমনই ছিল যেমনটি হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর যখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকরের কাছে একথা শুনেন তখন তিনি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, আর হুরমুযানকে ডাকেন। যখন সে (অর্থাৎ হুরমুযান) তার কাছে আসে তখন তিনি তাকে বলেন, আমার সাথে চল, আমরা আমার ঘোড়া দেখতে যাব, এবং নিজে তার পেছনে হাঁটতে থাকেন। যখন সে তার সম্মুখে হাঁটতে থাকে তখন তিনি তার (অর্থাৎ হুরমুযানের) ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন, যখন সে তরবারির তীক্ষ্ণতা অনুভব করে তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এরপর আমি জুফাইনাকে ডাকি। সে হীরার খ্রিষ্টানদের একজন খ্রিষ্টান ছিল আর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের সাহায্যকারী ছিল। তিনি তাকে চুক্তির অধীনে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন যা কিনা তার ও জুফাইনা'র মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। সে মদীনায় লেখা শেখাত। যখন আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করি তখন সে তার চোখের সামনে ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। অতঃপর হযরত উবায়দুল্লাহ্ সামনে অগ্রসর হন এবং আবু লুলু'র কন্যাকেও হত্যা করেন, যে মুসলমান হবার দাবি করত। হযরত উবায়দু ল্লাহ্‌র সংকল্প ছিল যে, আজ তিনি মদীনার বুকে কোন কয়েদি বা যুদ্ধবন্দিকে জীবিত রাখবেন না। মুহাজিররা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে বাধা দেয় এবং তাকে সাবধান করেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব আর তিনি মুহাজিরদেরও সমীহ করেন নি। এমনকি হযরত আমর বিন আস (রা.) তার সাথে অনবরত কথা বলতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর কাছে তরবারি সমর্পণ করেন। অতঃপর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তার কাছে আসেন। তখন তারা দু 'জন একে অপরের ললাটের চুল ধরে ফেলেন। মোটকথা তিনি হুরমুযান, জুফাইনা ও আবু লুলু 'র কন্যাকে হত্যা করেন।

এখন সকল বিষয় এ বিতর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-কে হত্যা করতে যে ব্যক্তি আবু লুলু'কে উস্কানি দিয়েছিল আর আমাদের কাছে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে- সেগুলো এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত উমর (রা.)'র হত্যা একটি (গভীর) ষড়যন্ত্র ছিল। এই লেখক লিখেছেন (এবং) যিনি এ কথার পক্ষে যে, এটি এক (পূর্বপরিকল্পিত) ষড়যন্ত্র ছিল। এসব ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল হুরমুযান। সে হযরত উমর (রা.)'র বিরুদ্ধে আবু লুলু'র হিংসা-বিদ্বেষ আরও উস্কে দেয়। তারা উভয়ে ছিল অনারব। এছাড়া হুরমুযানকে যখন বন্দী করা হয় এবং তাকে মদীনা প্রেরণ করা হয় তখন সে এই আশংকার বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে যে, খলীফা তাকে হত্যা করবেন।

তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ নাফে'র রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে যে, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সেই ছুরিটি দেখেছিলেন যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। তাবারীতে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সেই খঞ্জর দেখেছিলেন যেটি আবু লুলু , জুফাইনা এবং হুরমুযানের মাঝে পড়ে গিয়েছিল, ঘটনাক্রমে তিনি (তথা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর) হঠাৎ তাদের কাছে এসেছিলেন। হাঁটার সময় সেটি পড়ে গিয়েছিল। উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কাছে একথা শুনতেই তাদের উভয়ের কাছে যান এবং তাদেরকে হত্যা করেন। কেবল তাদের উভয়কে হত্যা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি প্রতিশোধের স্পৃহার কাছে পরাস্ত হয়ে আবু লুলু'র কন্যাকেও হত্যা করেন। সেই খঞ্জরটি, যেটির বিষয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বলেছিলেন, তা অবিকল সেটিই ছিল যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর যদি হু রমুযান এবং জুফাইনা'কে হত্যা করার ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি না করতেন তাহলে তাদের উভয়কে ঘটনার তদন্তের জন্য ডাকা যেতো এবং এভাবে ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হতো। এসব বিষয় যদি দৃষ্টিপটে রাখা হয় তাহলে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় বুঝা যায় যে, এটি ছিল ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র ছিল আর যে সেই ষড়যন্ত্রকে কার্যে রূপান্তর করেছে এবং হযরত উমর (রা.)-কে হত্যা করেছিল সে ছিল আবু লুলু। এ হত্যাকে যারা ষড়যন্ত্র মনে করে এটি তাদের মত।

(সীরাত উমর ফারুক, প্রণেতা-মহম্মদ রেজা, অনুবাদক-মহম্মদ সরওয়ার গোহর সাহেব, পৃ: ৩৪০-৩৪৪)

এমনিভাবে আরেকজন জীবনীকার ড. মোহাম্মদ হোসেন হ্যায়কল নিজ পুস্তকে লিখেন, প্রকৃত ঘটনা হলো, মুসলমানরা যখন ইরানি ও খ্রিস্টানদের বিপক্ষে বিজয়ী হয় এবং সেসব দেশের শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেয় আর ইরানের বাদশাহকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে পলায়নে বাধ্য করে, তখন থেকে ইরানি ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা নিজেদের হৃদয়ে মোটের ওপর আরবদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষত হযরত উমর (রা.)'র বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের অগ্নি লু কিয়ে রেখে ছিল। তখন জনগণ পারস্পরিক কথাবার্তায় এই হিংসা-বিদ্বেষের উল্লেখও করেছিল। এছাড়া তাঁর ওপর আক্রমনকারী আবু লুলু একজন ইরানি, এটি জানার পর হযরত উমর (রা.)'র সেই কথাও তাদের মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে বারণ করতাম যে, আমাদের কাছে কোন বিধর্মীকে টেনে-হিঁচড়ে আনবে না, কিন্তু তোমরা আমার কথা য় কর্ণপাত করো নি। মদীনায় অনারব বিধর্মীদের

সংখ্যা স্বল্পই ছিল কিন্তু একটিদল ছিল তারা, যাদের হৃদয় ক্রোধ এবং প্রতিশোধের নেশায় পরিপূর্ণ ছিল, যাদের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। হতে পারে এটি তাদেরই ষড়যন্ত্র ছিল আর হয়ত আবু লুলু'র উক্ত কৃতকর্ম সেই ষড়যন্ত্রের পরিণাম, যার জাল ঐসব ইসলামের শত্রুরা নিজেদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার পিপাসা নিবারণের জন্য বুনেছিল। আর তারা ভেবেছিল, এভাবে আরবদের একতা টুকরো টুকরো করে মুসলমানদের ক্ষমতা খর্ব করা যাবে।

ঘটনার আসল রহস্য জানার জন্য হযরত উমর (রা.)'র পুত্ররা সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। রহস্য উন্মোচন করে ঘটনার গভীরে তারা প্রবেশ করতে পারতেন যদি আবু লুলু ফিরোয আত্মহত্যা না করত কিন্তু সে আত্মহত্যা করে সেই রহস্য নিজের সাথে কবরে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো এটিই কি বিষয়ের অবসান? এ রহস্য উদঘাটনের কি কোন উপায় নেই? এই লেখক যিনি এর রহস্য উদঘাটনের পক্ষে তিনি লিখেন, না বরং ঐশী তকদীর চেয়েছে যে, আরবের এক সর্দার সেই রহস্য সম্বন্ধে যেন অবগত হন এবং সেই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) যখন সেই ছুরিটি দেখেন যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল, তিনি বলেন, আমি গতকাল এই ছুরি হুরমুযান এবং জুফাইনার হাতে দেখেছিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- এই ছুরি দিয়ে কী করবে? তারা বলে, মাংস কাটব কেননা, আমরা মাংসে হাত লাগাই না আর হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)'র ঘাতক আবু লুলু'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জুফাইনা এবং হুরমুযান উভয়েই তার সাথে ছিল; তারা পরস্পর কানাঘুষা করছিল। হঠাৎ করেআমি তাদের কাছে গেলে তারা দৌড়ে পালায় আর অমনি ঘটনাচক্রে তাদের কাছে থাকা একটি দু'ধারী খঞ্জর পড়ে যার হাতলটি ছিল এর মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি বলেন, ভালো করে দেখ তো! হযরত উমর (রা.)'র হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত খঞ্জরটি দেখতে কেমন? মানুষজন দেখল, হুবহু সেই খঞ্জরটি-ই; যেমনটি হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বর্ণনা করেছেন। লেখক বলছেন, এ বিষয়েতাই আর সংশয়-সন্দেহের মোটেও অবকাশ থাকে না। তাদের দু'জনের উভয়েই সত্য সাক্ষ্যদাতা বরং মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যে ছুরিটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয় সেটি হুরমুযান এবং জুফাইনার কাছেছিল। তাঁদের এক সাক্ষীর মতে, তিনি (রা.) হত্যাকারী আবু লুলু 'কে হত্যাকাণ্ডের পূর্বে সেই দু'জনের সাথে চক্রান্ত করতে দেখেছেন আর উভয়ের মতে, এসব-ই ছিল সেই রাতের ঘটনা যার পরদিন ভোরবেলা হযরত উমর (রা.)'র ওপর আক্রমণ করা হয়। এতকিছুর পরেও কেউ কি এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে যে, আমীরুল মু'মিনীন যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তার মূল নায়ক ছিল এই তিনজন। তবে এটিও হতে পারে যে, অন্য কোন ইরানী অথবা অন্যান্য জাতির ব্যক্তিবর্গ এতে জড়িত থাকতে পারে যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছিল।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের সাক্ষ্য শোনামাত্রই হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী রক্তে রঞ্জিত বলে মনে হলো। তাঁর হৃদয়ে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মদীনা নগরীতে বসবাসরত সমস্ত অভিবাসীরা এই নেক্কারজনক ষড়যন্ত্রে শামিল এবং তাদের সবার হাত এ অপরাধের রক্তে রঞ্জিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারী ধারণ করেন এবং সর্বপ্রথমে হুরমুযান এবং জুফাইনা' কে শেষ করে দেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি প্রথমে হুরমুযানকে ডাকেন। সে যখন বেরিয়ে আসে তখন তিনি (রা.) বলেন, "আমার সাথে একটু আসো তো! আমার ঘোড়াটি দেখ"- এই বলে তিনি খানিকটা পিছনে সরে দাঁড়ান। সে যখন তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তরবারী দিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করেন। ইরানী সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ হুরমুযান) যখন তরবারীর প্রখরতা অনুভব করে তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'বলে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র পুত্র উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর বলেন, অতঃপর আমি জুফাইনা'কে ডাকি। সে ছিল হিরা নগরীর একজন খ্রিস্টান এবং হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র দুধভাই। এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেই হযরত সা'দ (রা.) তাকে মদীনাতে নিয়ে এসেছিলেন যেখানে সে লোকদের পড়ালেখা শিখাতো। যখন আমি তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করি তখন সে তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। হযরত আব্দুল্লাহ্'র অন্য ভাইও নিজ পিতৃহত্যার জেরে তার চেয়ে কোন অংশে কম উত্তেজিত ছিলেন না এবং সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)।

যাহোক, তিনি (রা.) যা করেছেন এর কোন আইনি সনদ ছিল না। স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা নিজের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য দাঁড়ানোর কারও কোন অধিকার নেই। যেখানে বিষয়ের সিদ্ধান্ত মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনি স্বয়ং এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর খলীফাগণের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা মানুষের মাঝে ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত দিতেন আর অপরাধীর বিরুদ্ধে কিসাসের সিদ্ধান্ত জারি করতেন। কাজেই হযরত উবায়দুল্লাহ্'র কর্তব্য ছিল- তিনি (রা.) যখন সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারেন যার ফলে তাঁর পিতার প্রাণহানী ঘটে; আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এর সুষ্ঠ বিচার দাবি করা। তাঁর দৃষ্টিতে এটি যদি ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হত তাহলে তিনি কিসাসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেন বা প্রমাণিত না হলে অথবা এ বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীনের হৃদয়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে অর্থাৎ নতুন খলীফার হৃদয়ে সৃষ্ট সন্দেহের কারণে সে অনুপাতে দণ্ড হ্রাস করতেন কিংবা এই রায় দিতেন যে, কেবল আবু লুলু'ই অপরাধী।

(আল ফারুক উমর, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদঃ হাবীব আশআর, পঃ ৮৬৯-৮৭২, ইসলামি কুতুব খানা, উর্দুবাজার, লাহোর)

মোটকথা, তিনি যা-ই করেছেন, আইনের দৃষ্টিতে এর কোন অধিকার ছিল না। সারকথা হলো,যদিও এটি একেবারে অমূলক নয় যে, এ হত্যাকাণ্ডটি রীতিমত ষড়যন্ত্র ছিল। কিন্তু সে সময়কার পরিস্থিতির দাবি অনুসারে হযরত উসমান (রা.) তৎক্ষণাত তদন্ত করাতে সক্ষম হন নি অথবা পরিস্থিতি যা-ই থাকুক না কেন, প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকরা এই সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এই যু গের কিছু ঐতিহাসিক লক্ষণাবলীর নিরিখে এ নিয়ে তর্ক করছে আর তাদের যুক্তিতে কিছুটা ওজন আছে বলেও মনে হয়। কেননা এই ষড়যন্ত্রকারীরা এখানেই থেমে থাকে নি। বরং পুনরায় হযরত উসমান (রা.)ও একই ধরণের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। আর এ কারণে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তা পায় যে, ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও বিজয়কে প্রতিহত করার জন্য এবং নিজেদের প্রতিশোধের আগুন নিভানোর জন্য বহিঃশক্তির একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অধীনে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। বাকী আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমার পিতার ওপর যখন আক্রমন হয় তখন আমি তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তঁ ার প্রশংসা করেছিল এবং বলেছিল জাযাকাল্লাহু খাইরান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্কে ভালোবাসি এবং আমি ভয়ও করি। লোকেরা বলল, আপনি খলীফা নিযুক্ত করে দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি কি আমার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও তোমাদের বোঝা বহন করব। আমার ভাগ সমানসমান হোক, এটিই আমি চাই। অর্থাৎ আমাকে যেন পাকড়াও করা না হয় আর আমি পুরস্কারও চাই না। যদি আমি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাই তাহলে তিনিও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ছিলেন যিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)। যদি স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করি তাহলে কোন ক্ষতি নেই। যদি আমি তোমাদেরকে কোন স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করা ছাড়াই রেখে যাই তাহলে যিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন তিনিও তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা ছাড়াই রেখে গিয়েছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় উদাহরণ হযরত মহানবী (সা.)-এর দিয়েছিলেন- তিনি (সা.) কোন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেন, যখন তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, তিনি (রা.) স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন না।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ, বাব ইসতেখলাফ ওয়া তারকা, হাদীস-৪৭১৩)

সহীহ্ মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত হাফসা (রা.)'র কাছে যাই। তিনি বলেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেন না? তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন, আমি বললাম তিনি এমনটি করবেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত হাফসা (রা.) বলেন, তিনি এমনটিই করবেন। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন,আমি কসম খেয়ে বললাম, আমি হযরত উমর (রা.)'র সাথে পুনরায় কথা বলব। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন যে, আমি সকাল পর্যন্ত নিরব থাকি আর তঁ ার সাথে কোন কথা বলি নি। আমার অবস্থা এমন

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

ছিল যে, আমি আমার শপথের কারণে পাহাড়সম বোঝা অনুভব করছিলাম। এরপর আমি ফিরে আসি এবং তাঁর (রা.) কাছে যাই। তিনি (রা.) আমার কাছে মানুষের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। এরপর আমি তাঁকে হাফসা (রা.) যা বলেছিলেন তা বলি। এরপর আমি বলি, আমি লোকেদের একটি কথা বলতে শুনেছি আর আমি শপথ করে বলেছি যে, আমি আপনার কাছে সে কথা অবশ্যই বলব। মানুষের ধারণা হলো, আপনি স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করবেন না। বিষয় হলো, যদি কেউ আপনার উট বা বকরি দেখাশোনাকারী হয় আর সে সেগুলো ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসেতাহলে আপনি দেখবেন যে, সে সেগুলো নষ্ট করেছে। অতএব, মানুষের তত্ত্বাবধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন, হযরত উমর (রা.) আমার সাথে একমত হন এবং কিছুক্ষণের জন্য মাথা নত করেন। এরপর তিনি মাথা তুলেন আর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন, মহান আল্লাহ্ নিজেই তাঁর ধর্মের সুরক্ষা করবেন। যদি আমি কাউকে খলীফা মনোনীত না করি তাতে কী হবে? মহানবী (সা.)-ও তো কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। আর যদি আমি খলীফা মনোনীত করি সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। ইবনে উমর তথা হযরত উমর (রা.)'র পুত্র বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি (রা.) যখন হযরত মহানবী (সা.)-এর নাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম, তিনি (রা.) কাউকে মহানবী (সা.)-এর সমকক্ষ করবেন না এবং তিনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন না।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ, বাব ইসতেফলাফ ওয়া তারকা)

হযরত মেসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) বর্ণনা করেন , হযরত উমর (রা.)-কে যখন আহত করা হয় তিনি বেদনায় বিমূঢ় ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে আপনি তো মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং অতি উত্তমরূপে আপনি তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। আর আপনি এমন অবস্থায় তাঁর থেকে পৃথক হয়েছেন যখন তিনি (সা.) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আপনি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথেও ছিলেন আর অতি উত্তমরূপে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। এরপর তাঁর থেকেও আপনি এমন অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যখন তিনি (রা.) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর আপনি তাঁদের সাহাবীদের সাথে ছিলেন আর আপনি অতি চমৎকারভাবে তাদের সঙ্গ দিয়েছেন, আজ যদি আপনি তাদের ছেড়ে যান তাহলে আপনি এমন অবস্থায় তাদের ছেড়ে যাবেন যখন তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত উমর (রা.) বলেন, এই যে তুমি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে এটা আমার প্রতি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তুমি যে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা বললে এটিও আমার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ। আর তুমি যে আমার দুঃচিন্তা বা উদ্বেগ দেখছ এই উৎকণ্ঠা মূলত তোমার ও তোমার সঙ্গীদের জন্য। আমি আমার ব্যাপারে চিন্তিত নই বরং আমি তো তোমার ও তোমার সঙ্গীদের চিন্তা করছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে যদি পৃথিবীসম সোনাও থাকতোতবে আমি অবশ্যই তা ফিদিয়াস্বরূপ দিয়ে হলেও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ র শাস্তি দেখার পূর্বেই তা থেকে মুক্তি নিয়ে নিতাম।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস০ ৩৬৯২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, "খলীফারা এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হন নি যেটিকে তারা ভয় পেয়েছেন। আর যদি এমন কোন বিপদ এসে থাকেতাহলে আল্লাহ্ সেটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত উমর (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন কিন্তু ঘটনা প্রবাহ দেখলে বুঝা যায়, এই শাহাদতের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র কোন ভয়ই ছিল না বরং তিনি সবসময় দোয়া করতেন যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দাও আর আমাকে মদীনাতেই শহীদ করো'। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর সারা জীবন এই দোয়া করে কাটান যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মদীনায় শাহাদতের সৌভাগ্য দিও, তিনি যদি শহীদও হয়ে যান তাহলে আমরা একথা কীভাবে বলতে পারি যে, তিনি এক ভীতিপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন অথচ আল্লাহ্ এটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায়রূপান্তরিত করেন নি। এতে সন্দেহ নেই, যদি হযরত উমর (রা.) শাহাদত বরণকে ভয় পেতেন আর তিনি শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে বলা যেতে পারতো যে, তাঁর ভয়কে আল্লাহ্ শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন নি। কিন্তু তিনি তো অনবরত দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমাকে মদীনায় শাহাদত দান কর। অতএব, তার শাহাদতবরণ থেকে একথা কীভাবে সাব্যস্ত হতে পারে যে, তিনি শাহাদত বরণকে ভয় পেতেন! যেক্ষেত্রে তিনি শাহাদত বরণকে ভয়ই পেতেন না বরং শাহাদত লাভের জন্য দোয়া করতেন যা আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেছেন সেক্ষেত্রে বুঝা গেল, এই আয়াত সংশ্লিষ্ট এমন কোন ভয়ের তিনি সম্মুখীন হন নি যেটিকে তাঁর হৃদয়অনুভব করেছেন আর এই আয়াতে যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, এটিই উল্লিখিত হয়েছে যে; খলীফারা যে বিষয়কে ভয় পাবেন তা কখনও সংঘটিত হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। কিন্তু কোন বিষয়কে খলীফা যখন ভয়ই পান না বরং সেটিকে নিজের সম্মান ও উন্নত পদমর্যাদার কারণ মনে করছেন সেক্ষেত্রে সেটিকে ভয় আখ্যা দিয়ে একথা বলা যে, এই ভয়কে কেন শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেওয়া হলো না - অবান্তর কথা। এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য।"

তিনি (রা.) বলেন, "আমি যখন হযরত উমর (রা.)'র উক্ত দোয়া পড়েছি তখন আমি মনে মনে বলেছি, বাহ্যত এ দোয়ার অর্থ ছিল, শত্রু মদীনায় আক্রমন করবে এবং তার আক্রমন এত ভয়াবহ হবে যে, সব মুসলমান মারা যাবে এরপর তারা যুগখলীফার কাছে এসে তাঁকেও শহীদ করবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমর (রা.) দোয়াকেও কবুল করেছেন আর এমন উপকরণ বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যার ফলে ইসলামের সম্মান বজায় থেকেছে। বাস্তবে মদীনায় বহিরাগত কোন শত্রুর আক্রমণ না হয়ে মদীনার ভেতর থেকেই এক নোংরা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং সে ছুরিকাঘাতে তাঁকে শহীদ করে দেয়।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা এবং এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ক্রীতদাস মুক্তি সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করতঃ বলেন,

"সর্বপ্রথম এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা অনুগ্রহ করে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে তথা ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও। এরপর এটি বলেছে যে, এমনটি যদি না করতে পার তবে মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন করে দাও। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন রয়ে যায় অর্থাৎ কোন দাস যদি নিজে মুক্তিপণ পরিশোধ করার সামর্থ্য না রাখে আর তার রাষ্ট্র অর্থাৎ যে দেশের সাথে তার সম্পর্ক সেই রাষ্ট্রের যদি তাকে স্বাধীন করার বিষয়ে কোন আগ্রহ না থাকে; আবার তার আত্মীয়স্বজনেরাও যদি ভ্রুক্ষেপহীন হয় তবে সে তোমাদের অনুমতি সাপেক্ষে কিস্তি আকারে মুক্তিপণ নির্ধারণ করাতে পারে। বন্দি নিজেও তার মুক্তিপণের কিস্তি নির্ধারণ করাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যতটুকু সে উপার্জন করবে, কিস্তির অংশ বাদ দিয়ে বাকীটা তারই প্রাপ্য হবে অর্থাৎ বাস্তবে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। অর্থাৎ সে যা আয় করবে তা থেকে সে মুক্ত হবার জন্য নির্ধারণকৃত কিস্তি প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ তারই থাকবে আর এটি এক ধরণের স্বাধীনতা বৈকি।

হযরত উমর (রা.)-কে এমনই এক দাস হত্যা করেছিল যে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি। সেই দাস যে মুসলমান ব্যক্তির নিকট থাকতো তাকে সে একদিন বলে, আমার এতটুকু সামর্থ্য আছে। আপনি আমার ওপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন যা আমি মাসিক কিস্তি আকারে ধীরে ধীরে সবটুকু পরিশোধ করবো। তিনি অত্যন্ত সামান্য অংকের একটি কিস্তি নির্ধারণ করেন এবং সে তা পরিশোধ করতে থাকে। একবার হযরত উমর (রা.)'র কাছে সে অভিযোগ করে, আমার মালিক আমার ওপর মোটা অঙ্কের কিস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে, তাই আপনি সেটি কমিয়ে দিন। হযরত উমর (রা.) তার আয় -উপার্জনের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেন, যতটুকু উপার্জন হওয়ার কথা ভেবে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সে আয় করে থাকে। হযরত উমর (রা.) এটি দেখে বলেন, এই পরিমাণ আয়ের বিপরীতে তোমার কিস্তি তো খুবই নগণ্য, তাই এরচেয়ে কমানো সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের কারণে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং সে ভাবে, আমি যেহেতু ইরানী তাই আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে আর আমার মালিক যেহেতু আরব তাই তাকে সমীহ করা হয়েছে। কাজেই, এই রাগের বশে পরের দিন সে তাঁর (রা.) ওপর খঞ্জরের আক্রমন করে এবং তিনি (রা.) সেই আঘাতের ফলে শহীদ হয়ে যান।"

(ইসলামী ইকতেসাদী নিযাম, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৮-২৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন, "পৃথিবীতে কেবল দু'টি জিনিস সততা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, হয় চরম বিদ্বেষ নয়তো সীমাহীন ভালোবাসা। অনেক সময় একটি তুচ্ছ ঘটনা থেকেও চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.)'র সময়ে দেখ! কত সামান্য ঘটনা থেকে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইসলামী বিশ্বকে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। আমি মনে করি, এ ঘটনার জের এখনো চলমান রয়েছে। হযরত উমর (রা.)'র যুগে তাঁর কাছে একটি মামলা উপস্থাপিত হয়। (বিষয় হলো,) কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস

আয় করতো অনেক কিন্তু তার মালিককে কম দিতো। হযরত উমর (রা.) এই ক্রীতদাসকে ডেকে বলেন, মালিককে বেশি প্রদান করো। সে সময় পেশাজীবি মানুষ কম ছিল তাই কামার এবং কাঠমিস্ত্রির খুব কদর ছিল। সেই ক্রীতদাস আটা পেষার চাক্কী বানাতো এবং এর ফলে সে ভালো আয়-রোজগার করতো। হযরত উমর (রা.) তার জন্য সাড়ে তিন আনা নির্ধারণ করে বলেন, মালিককে এই পরিমান দিবে। এটি খুবই সামান্য অঙ্ক কিন্তু তার ধারণা ছিল, হযরত উমর (রা.) ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এর ফলে তার হৃদয়ে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একবার হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আমাকেও একটি চাক্কী বানিয়ে দাও। উত্তরে সে বলে, এমন চাক্কী বানিয়ে দিবো যা খুব ভালো চলবে। এটি শুনে কেউ একজন হযরত উমর (রা.)-কে বলে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে। পূর্বে বর্ণিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিংবা একই ঘটনা এটি। মোটকথা, তারই ঘটনা এটি অর্থাৎ সেই ক্রীতদাসের। তিনি (রা.) বলেন, তার শব্দ থেকে এমনটি প্রকাশ পায় না। প্রথম রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.) নিজেই বলেছিলেন, সে হুমকি দিচ্ছে। সে বলে, তার কণ্ঠ হুমকির সুর ছিল। অবশেষে একদিন উমর (রা.) নামায পড়ছিলেন, এমন সময় সেই দাস তাঁকে খঞ্জর দিয়ে হত্যা করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, সেই উমর (রা.) যিনি কোটি কোটি মানুষের বাদশাহ্ ছিলেন, যিনি বিশাল রাজত্বের শাসক ছিলেন, মুসলমানদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক ছিলেন, তঁ াকে মাত্র সাড়ে তিন আনার জন্য হত্যা করা হয়। কিন্তু বিষয় হলো , যাদের প্রকৃতিতে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকে সে সাড়ে তিন আনা কিংবা দুই আনা দেখে না বরং তারা তাদের মনের জ্বালা মিটাতে চায়। তাদের প্রকৃতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় তারা দেখে না, আমাদের বা অন্যের জন্য এটি কী পরিণতি বয়ে আনবে। হযরত উমর (রা.)'র হন্তারককে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, সে এই পাশবিক কাজটি কেন করেছিল? তখন সে উত্তরে বলেছিল, আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল, তাই আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।"

এটি পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয় নি। হতে পারে, তাকে ধরার সময় সে যে সময়টুকু পেয়েছে তখন বলেছিল, আমি এ কারণেএই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছি আর এরপর সে আত্মহত্যাও করে বসে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি এই হৃদয় বিদারক ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছি, ইসলাম এখনও এর জের কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আর সেটি এভাবে যে, যদিও মৃত্যু সবসময় মানুষের সাথে লেগেই আছে, তথাপি এমন সময় মৃত্যুর কথা ভাবাও হয় না যখন অঙ্গাপ্রতঙ্গা সুদৃঢ় থাকে, কিন্তু অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা যখন দুর্বল হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য অবনতির দিকে ধাবিত হয় তখন মানুষ নিজে থেকেই ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে না কিন্তু আপনা আপনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যা ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য ইমামের মৃত্যুর সময় মানুষ সচেতন থাকে। বয়স ৬৩ বছর হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু হযরত উমর (রা.)'র অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা মজবুত ছিল তথাপি সাহাবীদের মাথায় এটি ছিল না যে, হযরত উমর (রা.) এত তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এজন্য তারা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর ছিলেন। অর্থাৎ অকস্মাৎ হযরত উমর (রা.)'র মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়। সেই সময় জামা'ত অন্য কোন ইমামকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রস্তুতি না থাকার ফলাফল যা দাঁড়ায়তা হলো, হযরত উসমান (রা.)'র সাথে মানুষের তেমন গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। এ কারণে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং হযরত আলী (রা.)' র যুগে আরো বেশি দুর্বল হয়ে যায়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃ: ২৪০-২৪১)

পরবতীতে যেসব নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এটিও হতে পারে- যার উল্লেখ তিনি করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিও বলেছেন যে, নৈরাজ্যের যুগে নামাযের স্থানে কিছু লোক নিরাপত্তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে অর্ধেক লোক দণ্ডায়মান থাকবে। যদিও এটি যুদ্ধের সময়কার কথা যখন নিরাপত্তার জন্য একটি দলের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু এ থেকে এই ব্যাখ্যাও করা যায় যে, ছোটোখাটো বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে যদি কিছু সংখ্যক লোককে নামাযের সময় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় তাহলে এটি আপত্তির কোন বিষয় নয় বরং এটি করা অত্যাবশ্যক। তিনি (রা.) বলেন, যুদ্ধের সময় যদি এক হাজারের মধ্যে পাঁচশ' জনকে নিরাপত্তার জন্য দাঁড় করানো যেতে পারে তাহলে কী ছোটোখাটো শঙ্কার সময় এক হাজারের মধ্যে থেকে ৫-১০জন লোককেও নিরাপত্তার জন্য দাঁড় করানো যাবে না? বিপদ নিশ্চিত নয়- এটি বলা বৃথা কাজ। হযরত উমর (রা.)'র সাথে কী হয়েছে? তিনি (রা.) নামায পড়ছিলেন এবং মুসলমানরাও নামায পড়ায় মগ্ন ছিল, এমন সময় এক দুর্বৃত্ত মনে করে, আক্রমণের জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। তাই সে সামনে অগ্রসর হয় আর খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে বসে। এই ঘটনার পরও যদি কেউ বলে, নামাযের সময় পাহারা দেয়া নামাযের নিয়মনীতি বা মর্যাদা পরিপন্থী কাজ তাহলে সে তার মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করে না। এর দৃষ্টান্ত সেই মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেআর একটি তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হওয়ায় রক্ত বের হতে থাকে। তখন সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে এবং রক্ত মুছতে মুছতে একথা বলছিল, হে আল্লাহ্! এটি যেন একটি স্বপ্নই হয়। এটি যেন সত্য ঘটনা না হয় যে, আমি তির-বিদ্ধ হয়েছি। ইতিহাস হতে এটিও প্রমাণিত যে, একবার সাহাবীরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন নি, যার ফলে তাঁদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন হযরত আমর বিন আস (রা.) যখন মিশর বিজয়ের উদ্দেশ্যে যান এবং সে অঞ্চল জয় করেন তখন তিনি নামায পড়ানোর সময় পাহারার ব্যবস্থা করতেন না। শত্রুপক্ষ যখন লক্ষ্য করে, মুসলমানরা এ অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্যমনষ্ক থাকে তখন তারা একটি দিন নির্ধারণ করে কয়েক'শ সশস্ত্র ব্যক্তিকে ঠিক সেই সময় প্রেরণ করে যখন মুসলমানরা সিজদারত ছিল আর পৌঁছামাত্রই তারা তরবারি দিয়ে মুসলমানদের শিরচ্ছেদ করতে শুরু করে। ইতিহাস সাক্ষী, শত শত সাহাবী সেদিন হয় নিহত হয় নতুবা আহত হয়। এক জনের পর আরেকজন এবং দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল কিন্তু সাথের জন বুঝতেই পারছিল না যে, এসব কী হচ্ছে! ততক্ষণে সেনাবাহিনীর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তাকে অনেক ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, আপনি কি জানতেন না যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু তিনি, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) কি জানতেন যে, মদীনাতে তাঁর সাথেও এমনটিই ঘটবে! এই ঘটনার পর থেকে সাহাবীরা (নিরাপত্তার) ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ, যখনই নামায পড়তেন সর্বদা নিরাপত্তার খাতিরে পাহারাদার নিযুক্ত করতেন। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬৮-৬৯)

হযরত উমর (রা.)'র ঋণ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে এসম্পর্কে বলেছিলেন। এ সম্পর্কে আরও কথা হলো, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর! দেখ তো আমার ঋণের পরিমাণ কত? তিনি হিসাব করে দেখেন, (ঋণের পরিমাণ হলো) ৮৬ হাজার দিরহাম। তিনি (রা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! যদি উমরের বংশধরদের সম্পদ এর জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হয় তবে তাদের সম্পদ হতে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে, কিন্তু তাদের সম্পদ যদি যথেষ্ট না হয় তবে বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের কাছ থেকে চেয়ে নিবে আর যদি তাও যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের কাছে চাইবে। এছাড়া অন্য কারও কাছে যাবে না। সাহাবীগণ জানতেন, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্থ আমাদের এই ইমাম এত বড় অংক নিজের জন্য ব্যয় করেন নি, (বরং) তাঁরা জানতেন, এই অর্থও তিনি অভাবী ও দরিদ্রদের পেছনেই ব্যয় করেছিলেন, যে কারণে এ পরিমান ঋণ হয়ে গেছে। এজন্য হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে আপনার এই ঋণ পরিশোধ করে দেন না কেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র আশ্রয়ে আসছি! তুমি কি চাও, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার (মৃত্যুর) পর একথা বলে বেড়াও যে, আমরা তো আমাদের অংশ উমরের জন্য উৎসর্গ করেছি। এখন তো তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিবে, কিন্তু আমার (মৃত্যুর) পর এমন বিপদ আপতিত হতে পারে যেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি লাভের কোন উপায় থাকবে না। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে বলেন, আমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। অতএব, তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) সমাহিত হবার পূর্বেই তাঁর ছেলে শূরার সদস্যবৃন্দ ও কতক খ্রিস্টানকে তাঁর এই জামানতের বিষয়ে সাক্ষী রাখেন, অর্থাৎ ঋণ (পরিশোধের) যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন (তার ওপর)। হযরত উমর (রা.) সমাহিত হওয়ার পর এক জুমু'আ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ঋণের অর্থ নিয়ে হযরত উসমান (রা.)'র নিকট উপস্থিত হন এবং কয়েকজন সাক্ষীকে সামনে রেখে এই বোঝা থেকে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

ঋণ পরিশোধ-সংক্রান্ত আরেকটি রেওয়ায়েত 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যখন হযরত উমর (রা.)'র মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি (রা.)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

এই ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমানের এই বিশ্বাস কিয়ামত পর্যন্ত অটুট ও অবিচল থাকবে যে কুরআন মজীদ আল্লাহ্র বাণী আর অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকেই আল্লাহ্ সেটিকে নিজ নিরাপত্তায় রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত রাখবেন। আর এটিও এক সত্য যে বিগত চৌদ্দশ বছরে শয়তানী শক্তিসমূহ শত শত বার এই বাণীর মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করার চেষ্ট করেছে আর সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। অতি সম্প্রতি লখনউ-এর ওয়াসীম রিজবী নামে জনৈক ব্যক্তি ভারতের সুপ্রীম কোর্টে কুরআন করীমের মধ্য থেকে ২৬ আয়াত বের করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। আবেদনকারীর দাবি, এই আয়াতগুলিতে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যার কারণে বর্তমান যুগে কিছু সংগঠন কয়েক শ্রেণীর যুবককে সন্ত্রাসবাদে অনুপ্রাণিত করছে। তাঁর দাবি, এই আয়াতগুলি হযরত মহম্মদ (সা.)এর জীবদ্দশায় কুরআন করীমের অংশ ছিল না, পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন=এর মধ্যে প্রথম তিন খলীফা এই আয়াতগুলিকে কুরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আলহামদোলিল্লাহ! ২০২১ সালের ১২ই এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে দৈনিক হিন্দসমাচার, ২০২১, ১৩ই এপ্রিল-এর সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

নতুন দিল্লী, ১২ই এপ্রিল (ইউ, এন.আই): এদিন সোমবার সুপ্রীম কোর্ট কুরআন মজীদের ২৬ টি আয়াত অপসারণের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। জাস্টিস রোহিঙ্টন ফালী নারীম্যান=এর নেতৃত্বের বেঞ্চ উত্তর প্রদেশ শিয়া বোর্ডের সাবেক চেয়ার ম্যান ওয়াসীম রেজবী-এর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এবং তার উপর ৫০ হাজার টাকা জরিমান করেছে। জাস্টিস নারিমান বলেন, 'এটি সম্পূর্ণভাবে অনাবশ্যক একটি রিট পিটিশন। ' মামলার শোনানীর সময় জাস্টিস নারিমান জিজ্ঞাসা করেন যে আবেদনকারী কি তা নিজের আবেদনের বিষয়ে আন্তরিক? আপনি কি সত্যিই এই মামলার শোনানী চান? আপনি কি সংবেদনশীল? "

কুরআন করীমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকারী ওয়াসীম রিজবীর পক্ষ থেকে সিনিয়র এডভকেট আর.কে রাইজাদা উত্তর দেন যে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার নিয়ম কানুনের জন্য নিজের আবেদনের পরিসরকে সীমিত রাখতে চান। এরপর তিনি নিজের মোয়াক্কেলের অবস্থান তুলে ধরেন, কিন্তু তাতেও বিচারপতিদে বেঞ্চ সন্তুষ্ট হয় নি। তাঁরা ৫০ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য পূর্বক আবেদনটিকে খারিজ করে দেন।

স্মতর্ব্য যে রিজবীর আর্জিতে বলা হয়েছিল যে এই আয়াতগুলিতে মানবতার মূল নীতি উপেক্ষিত হয়েছে। এটি ধর্মের নামে বিদ্বেষ, খুনোখুনি ও হানাহানির প্রসার ঘটায়। একই সাথে এই আয়াতগুলি সন্ত্রাসবাদকে প্রশয় দেয়। রিজবী সাহেবের এও দাবি যে, এই কুরআনী আয়াতগুলি মাদ্রাসাসমূহে পড়ানো হচ্ছে, যা তাদেরকে কট্টরবাদে পরিণত করছে। আবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে, কুরআনের এই ২৬টি আয়াতে সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যে শিক্ষা সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে, তা নিষিদ্ধ হওয়াই বিধেয়। '

(হিন্দ সমাচার, জলন্ধর, পাঞ্জাব, ১৩ই এপ্রিল, ২০২১)

আল হামদোলিল্লাহ্! ২৬ আয়াতের বিলোপ করার আবেদন তো খারিজ হয়ে গেল, কিন্তু আবেদনকারী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গারা উক্ত আয়াতসমূহ এবং বুখারীর কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কুরআন মজীদ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমগুলিতে সন্দেহ তৈরীর চেষ্টা করেছে। যার ফল কিছু অমুসলিমদের মনে প্রশ্ন জেগেছে-

১) একজন মুসলমান যখন কুরআন করীমের সম্পর্কে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অভিযোগ আরোপ করেছে, তখন এর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে?

২) অপরদিকে মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী লিখিত আপত্তির উত্তর চায়, যাতে সেই উত্তরের আলোকে নিজেদেরকে এবং অমুসলিম বন্ধুদেকে কুরআন করীমের সত্যতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে পারে।

উপরোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে ওয়াসীম রিজবী দ্বারা লিখিত আপত্তিসমূহের উত্তর লেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে দোয়া করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা যেন এই উত্তরগুলির মাধ্যমে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষদের অন্তরে তৈরী হওয়া বিভ্রান্তির অপনোদন করেন। আমীন। এবং খোদায়ে করীম কুরআন করীমের উপর তাদের ঈমান ও প্রত্যয়ে আও বেশি শক্তি দান করুন।

১নং আপত্তি।

মহানবী (সা.) ৬৩২ সনে ইন্তেকালের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মানবতার জন্য একটি বাণী দিয়েছিলেন। আর এই কুরআন তাঁর জীবদ্দশাতে তৈরী হয় নি, তাঁর মৃত্যুর পর তৈরী হয়েছে।

উত্তর- প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের বিশ্বাস,ব্রহ্মান্ডের অধিপতি প্রতিপালক সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (স.) -এর পর প্রায় ২৩ বছর ধরে কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন। আর সেই অবতীর্ণকারীই সেই কুরআনে চিরকালের জন্য ঘোষণা দিয়েছেন যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(1) (সূরা হিজর, আয়াত:১০) অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা এই যিকর-কে অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই একে রক্ষা করব। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমিই কুরআন করীম নাযেল করেছি এবং আমিই এর রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হব। পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন মানুষের পক্ষে এর মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন করার ক্ষমতা নেই। এই প্রতিশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, কোন মানুষ যদি কুরআন করীমের মধ্যে কোন পরিবর্তন অথবা সংযোজন বা বিয়োজন করার দুঃসাহস দেখায়, সর্বশক্তিমান খোদা তাকে এমনটি করতে বাধা দিবেন। আর বিগত চৌদ্দশ বছর এর সাক্ষী।

কুরআন মজীদ অবতীর্ণ ও একত্রিত করার তারিখ:

একটি অনুমান অনুসারে ২৪ নাতিক (রমযান), ইং ২০ আগস্ট, ৬১০ সনে কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। এবং ১১লা রবিউল আওয়াল ১১ই হিজরী, ইং ৬৩২ সনের ২৬ শে মে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ হতে থাকে। সেই হিসেবে তাঁর নবুয়তের দিন সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাত হাজার নয় শ সত্তর দিন। কুরআন করীমের মোট শব্দ সংখ্যা ৭৭,৯২৪টি। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৯টি করে শব্দ অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কোন কোন সময় বেশি পরিমাণে আবার কোন কোন সময় স্বল্প পরিমাণে কুরআনের আয়াত নাযেল হত। আর যতগুলি আয়াত নাযেল হত তা মৌখিকভাবে সাহাবাদের মুখস্ত করিয়ে দেওয়াই আঁ হযরত (সা.) রীতি ছিল। কুরআন নাযেল হওয়ার পর থেকে তা মুখস্ত না হওয়া পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল আঁ হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে যেতেন না। জিবরাঈল যাওয়ার পর যখন তিনি সাহাবদের কাছে যেতেন, তখন তিনি নাযেল হওয়া আয়াতগুলি সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত করিয়ে দিতেন আর এভাবে কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সংরক্ষিত হয়ে আসত। সাহাবাদের মন ও মস্তিষ্কে যে কুরআন মজীদ একত্রিত ও সংরক্ষিত হতে থাকত তা তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনরা ধারণ করেছে আর সেই একই কুরআন আজও প্রজন্ম পরম্পরায় মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে এসেছে। ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় যে শেষ হজ করেছিলেন তাতে প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবা ছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে কুরআনের বহু হাফিযও ছিলেন। এছাড়া রমযানুল মুবারকে তারাবিহর নামাযের ধারাবাহিকতা শুরু হয় আর রমযানে সমগ্র বিশ্বের বড় বড় মসজিদ সমুহে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের হাফিজ (ইমাম) নামাযীদেরকে উচ্চস্বরে কুরআন মজীদ শুনিয়ে থাকেন। আর একজন হাফিজ ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকন যাতে ইমাম যদি কোন জায়গায় ভুল করে তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারাবিহর নামাযের এই পরম্পরা ইন্ডোনেশিয়া থেকে চিন, আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং আরব সর্বত্র সমানে চলছে। (ক্রমশ.....)

খুতবার শেষাংশ

হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত হাফসা (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, আমার ওপর কিছু ঋণ রয়েছে যা আল্লাহ্র সম্পদ হতে নেয়া। আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যখন আমার ওপর কোন ঋণ থাকবে না। অতএব, এ ঋণ পরিশোধের জন্য তোমরা এই বাড়িটি বিক্রি করে দিবে, অর্থাৎ যেখানে তিনি থাকতেন সেটি। এরপর যদি কিছু ঘাটতি থেকে যায় তাহলে বনু আদী গোত্রের কাছে চাইবে আর এরপরও যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে কুরাইশের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইবে না। হযরত উমর (রা.)'র মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ্বিন উমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র কাছে যান আর তিনি, অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উমর (রা.)'র বাড়িটি কিনে নেন। এটিকে 'দারুল কাযা' বলা হয়। তিনি (রা.) সেই বাড়িটি বিক্রি করে দেন এবং হযরত উমর (রা.)'র ঋণ পরিশোধ করেন। এজন্য এই বাড়িটি 'দারুল কাযায়ে দায়নে উমর' নামে অভিহিত হতে থাকে, অর্থাৎ সেই বাড়ি যা বিক্রির মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)'র ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল।

স্মৃতিচারণ এখনও চলছে আর আগামীকে অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

****

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সিঙ্গাপুর সফর

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিরা এমন এক স্থানে আছে যেখানে প্লেগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আমি অত্যন্ত বিচলিত এবং সেখানে পৌঁছাতে চাই। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, যেওনা। وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (সুরা বাকারা: ১৯৬) রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে তাদের জন্য দোয়া কর। তোমার নিজের যাওয়ার চাইতে এটি উত্তম হবে। এমন স্থানে যাওয়া গোনাহর কাজ। (মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৩)

অলঙ্কারাদির উপর যাকাত প্রদান

অ আহমদীদের জানাযা

অ-আহমদীদের পিছনে নামায

(২৬ শে এপ্রিল, ১৯০২ সন) এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, অলঙ্কারাদির উপর যাকাত আছে কি না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, যেমন কেউ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যায় সেগুলির জন্য যাকাতের ব্যতিক্রম হবে।

প্রশ্ন করা হল যে, যে ব্যক্তি এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি তার জানাযা পড়া বৈধ কি না? হযরত মসীহ মওউদ আঃ) বলেন,

যদি সে জামাতের বিরোধী ছিল এবং আমাদেরকে গাল-মন্দ করত এবং আমাদেরকে খারাপ মনে করত তবে তার জানাযা পড়ো না। আর যদি সে নীরব ও নিরপেক্ষ ছিল তবে তার জানাযা পড়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু শর্ত হল, নামাযে জানাযার ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে যেন কেউ হয়, নতুবা এর কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন করা হল, যদি নামাযের ইমাম হুযুর (আঃ) এর ব্যাপারে অবগত না হয়, তবে তার পিছনে পড়ব কি পড়ব না? হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, তোমাদের কর্তব্য হল তাকে অবগত করা। এর পর যদি সে সত্যায়ন করে তবে তা উত্তম , না হলে তার পিছনে নিজের নামায নষ্ট করো না। আর যদি কেউ নীরব থাকে, সত্যায়নও না করে আবার প্রত্যাখ্যানও না করে তবে সে মুনাফিক (কপট) । তার পিছনে নামায পড়ো না। এমন ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্য থেকে নয় এবং তার জানাযা পড়া এবং পড়ানোর মানুষ উপস্থিত রয়েছে, আর তারা তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে জানাযার ইমাম নির্বাচন করাকে পছন্দ করে না আর বিবাদের আশঙ্কা তৈরী হয়, তবে সেই স্থান ত্যাগ কর। এবং অন্য কোন পুণ্য কর্মে নিজেকে নিয়োজিত কর।

(মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৬)

সেভিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের স্কীম

(২৫ শে মে, সন ১৯০২) এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ পত্রে লিখেন যে, সেভিং ব্যাঙ্কের সুদ এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুদ বৈধ কি না। কেননা এটি অবৈধ হওয়ার কারণে মুসলমানদের ব্যবসা বানিজ্যে অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

হযরত আকদস (আঃ) বলেন, এটি শরিয়তের আলোকে আলোচ্য একটি বিষয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা পূর্বক দেখা না হয় এবং এর কারণে সৃষ্ট যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা আমাদের সামনে না রাখা হয়, আমি এটিকে বৈধ বলে মতামত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আল্লাহ তা'লা অর্থাপার্জনের জন্য শত সহস্র উপায় সৃষ্টি করে রেখেছেন। মুসলমানদের উচিত সেগুলি অবলম্বন করা এবং এর থেকে বিরত থাকা। ঈমান সিরাতে মুসতাকিমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবং আল্লাহ তা'লার আদেশকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায়। উদাহরণ স্বরূপ, পৃথিবীতে যদি একমাত্র সুদের ব্যবসায় সবচেয়ে লাভদায়ক ব্যবসায় পরিণত হয়, তবে কি মুসলমানরা কি এই ব্যবসা আরম্ভ করে দিবে? হ্যাঁ, যদি আমরা দেখি যে, এটিকে পরিত্যাগ করা ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনছে তবে, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ (সুরা নহল, আয়াত- ১১৬) আয়াতের অধীনে সুদকে বৈধ রূপে আখ্যায়িত করব। কিন্তু এটি এমন কোন বিষয় নয়, এটি নিতান্তই একটি ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত বিষয়। আমি এক্ষণে মহৎ মহৎ ধর্মীয় বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছি। আমি তো লোকেদের ঈমান নিয়ে চিন্তিত রয়েছি। এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগ দিতে পারি না। যদি আমি মহান কোন আন্দোলন ত্যাগ করে এখন থেকেই এমন তুচ্ছ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি তবে আমার উদাহরণ সেই বাদশার মত হবে যে কোন এক স্থানে অট্টালিকা নির্মাণ করতে চাই কিন্তু সেই স্থানটি বাঘ, হিংস্র পশু ও সাপের রাজত্ব, এছাড়াও মশা-মাছি ও পিঁপড়েরও উপদ্রব রয়েছে। অতএব সে যদি প্রথমে পশু ও সাপের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং সেগুলিকে নির্মূল না করে সর্বপ্রথম মশা-মাছি ধ্বংস করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তার কি দশা হবে? সেই প্রশ্ন কর্তাকে লেখা উচিত যে, তুমি সর্বপ্রথম নিজের ঈমানের চিন্তা কর। এবং দুই-চার মাসের জন্য এখানে এসে অবস্থান কর, যাতে তোমার মন ও মস্তিষ্কে জ্যোতির সঞ্চার হয় আর যেন এমন চিন্তায় না পড়।

(মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০)

নামায আরবী ভাষায় পড়া উচিত

নামায নিজস্ব ভাষায় পড়া উচিত নয়। খোদা তা'লা যে ভাষায় কুরান করীম অবতীর্ণ করেছেন সেটিকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে কিছু মসনুন পদ্ধতি ও জিকরে ইলাহিতে নিজের প্রয়োজনাবলীকে খোদার সামনে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু মূল ভাষাকে কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। খ্রীষ্টানরা মূল ভাষাকে ত্যাগ করে কি পরিণামই না ভোগ করল! কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। (মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০)

পান, হুকা, জর্দা (তামাক) ও প্রভৃতি

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

হাদীসে বর্ণিত আছে, وَمِنْ حُسْنِ الْاِسْلَامِ تَرْكُ مَالَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ, যে বস্তু আবশ্যকীয় নয় সেটিকে পরিহার করাও ইসলামের একটি সৌন্দর্য্য। অনুরূপভাবে পান, হুক্কা, জর্দা (তামাক) , আফিম ও প্রভৃতি এমন শ্রেণীর বস্তু। এই সমস্ত বস্তুকে এড়িয়ে চলার মধ্যেই সরলতা রয়েছে। কেননা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সেগুলির আর অন্য কোন ক্ষতিকর দিক নেই, তবুও এগুলির কারণে পরীক্ষার সম্মূখীন হতে হয় এবং মানুষ সমস্যার পঙ্কিলে আবদ্ধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বন্দী হয়ে গেলে খাবার তো জুটবে কিন্তু ভাং, চরস কিম্বা মনের মত জিনিস দেওয়া হবে না। আর যদি বন্দী না হয়ে এমন কোন স্থানে যাওয়া হয় যা বন্দী দশারই সমতূল্য, সেখানেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুস্থ-সবল শরীরকে কোন কু-অভ্যাসের কারণে ধ্বংস করা উচিত নয়। স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তুসমূহকে ঈমান বিনাশকারী আখ্যা দিয়ে শরিয়ত খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর এগুলির মধ্যে মুখ্য হল মদ।

এটি সত্য কথা যে, নেশা দ্রব্যাদি এবং তাকওয়ার মধ্যে শত্রুতা আছে। আফিমের কারণেও অনেক ক্ষতি হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এটি মদ অপেক্ষা ক্ষতিকর। এটি মানুষের জন্মজাত শক্তিসমূহকে নিঃশেষ করে দেয়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১৯)

জ্ঞান হল জ্যোতিঃ আর অজ্ঞতা হল এক প্রকারের মৃত্যু

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" স্মরণ রেখো! সর্বদা মূর্খরা পদস্খলিত হয়। শয়তানের পদস্খলন জ্ঞানের কারণে হয় নি, বরং নির্বুদ্ধিতার কারণে হয়েছিল। যদি সে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্জন করত তবে তার পদচ্যুতি ঘটত না। কুরান করীমে জ্ঞানের নিন্দা করা হয় নি বরং اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (সুরা ফাতির: ২৯) উল্লেখিত আছে। নীম মোল্লাঁ খাতরায়ে ঈমান, প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। অতএব আমার বিরোধীরা জ্ঞানের কারণে ধ্বংস হয় নি বরং অজ্ঞতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহর পয়গম্বর (সাঃ) বলেছেন , قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (সুরা ত্বহা: ১১৫) অতএব জ্ঞান যদি কোন তুচ্ছ বস্তু হত তবে এই দোয়া শেখানো হত না। এর পর বলা হয়েছে, مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا (আল-বাকারা: ২৭) অতএব যাবতীয় সৌভাগ্যের রসদ সঠিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে নিহিত। যত সংখ্যক মানুষ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা অজ্ঞতার কারণে তা করেছে। যদি জ্ঞান পূর্ণ হত তবে তারা মানুষকে খোদার মর্যাদা দিত না। খোদা তা'লা বলেন, জাহান্নামবাসীরা বলবে, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (আল মুলুক: ১১) এরা যে বলে اَلْعِلْمُ الْحِجَابُ الْاَكْبَر এটি ভুল কথা। اَلْجَهْلُ الْحِجَابُ الْاَكْبَر জ্ঞান হল জ্যোতিঃ, এটি পর্দা হতে পারে না। বরং অজ্ঞতাই হল বড় পর্দা। খোদার নাম হল সর্ব-জ্ঞানী। কুরানে বর্ণিত আছে, اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ (সুরা রহমান, ২,৩)। এই কারণেই ফিরিস্তারা বলেছিল, لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (সুরা বাকারা: ৩৩) সারমর্ম হল, যাবতীয় বিষ নিবুর্দ্ধিতার মধ্যেই নিহিত, এই কথাটি স্মরণ রেখো। প্রকৃতই অজ্ঞতা একটি মৃত্যু। সমস্ত চিকিৎসক ও অন্যান্য লোকেরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই বিভ্রান্ত হয়। যখন সারা জগতে অন্ধকার বিরাজ করে এবং সৃষ্টিকুল শয়তানের রূপ ধারণ করে এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে তখন নবীগণ জ্ঞান নিয়ে আবির্ভুত হন , আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : Azkarul Islam, Amaipur (Birbhum)

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমার অনুষ্ঠানে হুযুরের ভাষণ

একইভাবে সকল খোদ্দাম এবং আতফালদের প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত তা কয়েক রুকুই হোক না কেন বা কয়েক আয়াতই হোক না কেন। আপনাদের কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে যেন সর্বোত্তম নৈতিক শিক্ষা কি তা আপনারা রপ্ত করতে পারেন এবং আল্লাহ্ কি চান, তা যেন আপনারা বুঝতে পারেন। একটি পন্থা যা আপনারা অবলম্বন করতে পারেন তা হল কুরআনের যে কোন একটা নির্দেশকে বেছে নিন আর দৃঢ়ভাবে সংকল্প করুন যে, 'আমি এটি মেনে চলব' আর সেটিকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন। যেকোন মূল্যে আমি এটি মেনে চলব। আর এরকম দৃঢ় সংকল্প করুন যেন তা আপনার জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। যদি আপনাদের প্রত্যেকেই একটা দৃঢ় সংকল্প করে, একটা ক্ষতিকর জিনিস এড়ানোর চেষ্টা করে এবং একইভাবে একটি ভাল গুণ রপ্ত করার চেষ্টা করে যা কুরআন শিখিয়েছে, তাহলে বছর শেষে আপনি অনেক পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন আর অনেক পুণ্য পাপের জায়গা দখল করে নিবে। যতই পুণ্যের পথ অনুসরণ করবেন, তাকওয়ার পথ অনুসরণ করবেন ততই পাপ দূর হতে থাকবে। আরেকটি মহান গুণ যার বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি তা হল সত্য বলা। সত্য বলা সম্পর্কে আমি গুরুত্বারোপ করে থাকি।

আজকে ইজতেমা থেকে যখন ফিরে যাবেন আপনারা এই দৃঢ় এবং আন্তরিক সংকল্প নিয়ে যাবেন যে, আপনারা সবাই সদা সত্য বলবেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সদা সৎ পন্থা অবলম্বন করবেন। মিথ্যার বিন্দুমাত্র সংশ্রবণ যেন আপনার কথায় মিশ্রিত না থাকে। সকল স্থানে সকল সময়ে সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত। সত্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না। খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়ত বিভাগ নিশ্চিত করবেন, খোদ্দামরা যেন দৈনিক পাঁচ বেলা নামায পড়ে, কুরআন পাঠ করে এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পাঠ করে। একই সাথে তাদের এটিও নিশ্চিত করা উচিত, আমাদের খোদ্দামরা যেন সর্বদা সত্য বলে এবং সত্যের ভিত্তিতে কাজ করে। সব খোদ্দামের সত্য বলার গুরুত্ব বুঝা উচিত। খোদ্দামদের এই চেষ্টা খোদার নৈকট্যলাভের কারণ হবে। খোদ্দামকে এটি বুঝতে হবে যে, মিথ্যা বলা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার নামান্তর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সকল প্রকার প্রতিমাপূজা এবং মিথ্যা থেকে এড়িয়ে চলা উচিত কেননা মিথ্যা একধরনের মূর্তি। আর যে ব্যক্তি মিথ্যার ওপর নির্ভর করে সে আল্লাহ্‌তে আস্থা বিসর্জন দেয়। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে। মিথ্যা হল শিরক যা যেকোন মূল্যে আপনাকে প্রতিহত করতে হবে। আপনাদের মাঝে যারা জেনেশুনে মিথ্যা বলে বা প্রতারিত করে, তারা প্রতিমাপূজারীদের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তারা একই ধরনের পাপ করে। মিথ্যাকে তারা খোদার জায়গায় বসায়। তারা মিথ্যা বলে লাভবান হবে বলে মনে করে। তাদের ধারণা হল, সত্য বললে তারা শাস্তি পাবে। এটি স্মরণ রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সদা সত্য বলেন আর আল্লাহ্‌র শিক্ষা মেনে চলার খাতিরে সত্য বলেন তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনার চূড়ান্ত ক্ষতি হবে না। আরেকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা আপনার মাঝে সৃষ্টি করা উচিত তা হল, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, ভালবাসা প্রদর্শন করা। অন্যের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা করা। পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা। জাতিকে যদি সুদৃঢ় হতে হয় তাহলে জাতির মাঝে ঐক্য এবং একতা থাকা আবশ্যক এবং অন্যের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যের দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করা উচিত।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অনেক সময় অনেক তুচ্ছ বিষয় বা গুরুত্বহীন বিষয় অনেক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। যাদের ভাই-ভাই হওয়া উচিত তাদের মাঝে ভয়াবহ বিবাদ দেখা দেয়। আমাদের জামা'তে যদি এমন একজনও থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য পুরো জামা'ত বদনামের কারণ হয় আর আমাদের দাবী, ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারও 'পরে- এটি অর্থহীন প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা এবং ভালবাসার পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত। ক্রোধ প্রদর্শন করার মাঝে কোন মঙ্গল কিছু নেই বা এটি কোন ধরনের সাহসিকতার বিষয় নয়। সাহসের বিষয় হল নিজের রাগ এবং ক্রোধকে দমন করা। এক হাদীসে মহনাবী (সা.) বলেছেন, যারা একে অন্যকে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে ভালবাসে, কিয়ামত দিবসে এমন ব্যক্তিদের আল্লাহ্ তা'লা দয়ার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাই কিয়ামত দিবসে যদি আল্লাহ্ তা'লার করুণার ছায়াতে আশ্রিত হতে চান তাহলে পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। আমাদের সকল তুচ্ছ হিংসা এবং ঘৃণা পরিত্যাগ করা উচিত। পরস্পরকে ক্ষমা করা উচিত। এভাবে আমরা পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি এবং সাম্যের ভিতকে দৃঢ় করতে পারি আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করতে পারি। অতএব এগুলোকে সামান্য বিষয় হিসেবে নিবেন না বরং এসব গুণাবলী অবলম্বনের চেষ্টা করুন। আমি পূর্বেও বলেছি, খোদ্দামদের সংশোধন কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়, ব্যক্তিগতভাবে সংশোধন করা উদ্দেশ্য নয় বরং তা সমগ্র জামা'তের সংশোধন হিসেবে পর্যবসিত হয়। সকল ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করুন এবং সকল পাপ এতটা এড়িয়ে চলুন যেন ইবাদত আপনাদের জীবনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর সকল অনৈতিক কাজের প্রতি যেন আপনাদের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। জগতের পেছনে দৌড়ানো যেন আপনাদের উদ্দেশ্য না হয় বরং খোদার অধিকার প্রদান করা আপনাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। খোদার ইবাদতের পাশাপাশি ছাত্রদের তাদের পড়াশুনার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত। সব এমন ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে খুব পরিশ্রম করা উচিত। আর পড়ালেখায় সর্বোত্তম ফলাফল লাভের চেষ্টা করা উচিত। আপনারা যখন সাবালক হবেন তখন আপনারা যেন আপনাদের পেশায় সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম মানে পৌছতে পারেন। সত্যিকার অর্থে আহমদী যুবকদের সব ভাল ভাল পেশায় যাওয়া উচিত। সেটি সরকারী চাকরী হোক, সিভিল সার্ভিস হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্র। আমাদের খোদ্দামদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। এটি বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন তাই এর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের খোদ্দামদের মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরই অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত নয় বরং তাদের সর্বোত্তম পড়ালেখা করা উচিত। আমাদের জামা'তে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ছেলেদের চেয়ে পড়ালেখায় ভাল করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি খোদ্দামদের চ্যালেঞ্জ দিব, আপনারা এই ভারসাম্যহীনতা দূর করার চেষ্টা করুন এবং পড়ালেখায় সর্বোত্তম ফলাফল করার চেষ্টা করুন। যদি আপনারা সফল হন তাহলে এটি থেকে শুধু আপনারা লাভবান হবেন না বরং বৃহত্তর সমাজ লাভবান হবে আর আমাদের জামা'তের জন্য এটি গর্বের কারণ হবে এবং জামা'তের সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনাদের এই সাফল্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একাডেমিক সাফল্যকে নিশ্চিত করবে, তারা আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখে শিখবে। এভাবে পড়ালেখার উন্নতির একটা স্থায়ী চক্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সৃষ্টি হবে। জ্ঞানের সকল শাখার পরম মার্গে আপনারা পৌঁছবেন, ইনশাআল্লাহ্ কেননা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাঁর (আ.) মান্যকারীরা জ্ঞানের সকল শাখায় চরম মার্গে উপনীত হবে। তাই আপনারা সেই লোক হোন যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। তাহলে আপনারা ঐশী কল্যাণ এবং বরকতের ভাগী হবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে নিজেদের অসাধারণ দায়িত্বকে বুঝার তৌফিক দান করুন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে যে দায়িত্ব বর্তায় সেগুলো পালন করার তৌফিক দিন। আপনারা খোদার প্রাপ্য প্রদান করুন এবং তার সৃষ্টির প্রাপ্যও প্রদান করুন। আর আপনারা এমন লোক হোন যারা বিশ্বে আমাদের জামা'তের সুনাম প্রতিষ্ঠা করবে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের সাফল্য লাভের জন্য আমার আন্তরিক দোয়া থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াকে সকল অর্থে আশিসমণ্ডিত করুন, বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক বছর শেষ হতে চলেছে। অংশগ্রহণকারীদেরকে অতি সত্বর পুরো চাঁদা পরিশোধ করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদের প্রতিষ্ঠিতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

'আমি আপনাদেরকে বার বার এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি যে, ওয়াকফে জাদীদকে সুদৃঢ় করা জরুরী। কিন্তু এখন কাজের ব্যাপকতার কারণে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই একদিকে আল্লাহ্ তা'লা যেমন আপনাদের ধন-সম্পদে উন্নতি দিয়েছেন,তেমনি আপনাদেরকে জামাতের উন্নতির জন্যও উদার চিত্তে দান করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের তৌফিক দিন, আপনারা যেন সময়ের দাবি অনুধাবন করতে পারেন। খোদা করুন আপনারা যেন যমীন ও আসমানের আওয়াজ শোনেন এবং সম্মান লাভ করেন। (আল ফযল, ৩১ সে ডিসেম্বর, ১৯৫৯)

যেমনটি জামাতের সদস্যরা সম্যক অবগত আছেন যে ওয়াকফে জাদীদের বছর জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে ডিসেম্বরে সমাপ্ত হয়। ২০২১ সাল শেষ হতে এখন আর মাত্র ২ মাস বাকি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের কিছু সদস্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা শোধ করে দিয়েছেন। জাযাকুমুল্লাহ্॥ কিন্তু এখনও কিছু সদস্য আছেন যাদের চাঁদা বাকি রয়েছে, সেই সব সদস্যদেরকে নিজেদের চাঁদা পরিশোধের জন্য আবেদন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত সদস্যের প্রাণ ও সম্পদে অসাধারণ বরকত দান করুন। আমীন। (নাযিম মাল, ওয়াকফে জাদীদ, কাদিয়ান।)

কাবাবিরের লাজনা সদস্যাদের সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

গত ৬ জুন ২০২১ সালে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত কাবাবিরের লাজনা সদস্যাদের সাথে হুযূর(আই.)-এর ভার্চুয়াল মোলাকাত অনুষ্ঠিতহয়। আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের প্রধান প্রধান অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্ন: হুযূর, আমরা এই বিপদসংকুলপরিস্থিতি থেকে কীভাবে মুক্তি পেতেপারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): এরকম বিপদসংকুল পরিস্থিতি কিছু বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে যা সেই অঞ্চলকে গ্রাস করে নেয় আর বিশেষ করে মুসলমানরা সবসময় বিপদের ঝুঁকিতে থাকে। এই ক্ষেত্রে দোষ কার বা এক্ষেত্রে নীতি কেমন হওয়া উচিত- এই তর্ক বাদ দিয়ে মূলবিষয় হল ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে সবসময় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। আমরা নিজেরাই যখন তাদের সুযোগ তৈরি করে দিই তখন বিপদ আরো বেড়ে যায়। তাই এই এলাকায় অনেক প্রজ্ঞার সাথে বসবাসকরা উচিত। যেভাবে কাল বলেছি আপনাদের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করাউচিত যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রতিফলিত করবে। কাউকে ইসলামের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই বিপদ শুধুমাত্র এইএলাকায় সীমাবদ্ধ নেই বরং এখন বিপদসমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই বিপদ হল দাজ্জালী শক্তির মাধ্যমে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃতি যা মিডিয়া, ইন্টারনেটসহ বিভিন্নভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। যার প্রভাবে ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কিশোর-কিশোরীও নিজের ধর্ম ভুলে যাচ্ছে এবং জাগতিক ও বস্তুবাদিতার প্রতিবেশি মনোযোগ আকর্ষিত হচ্ছে।আমাদের এই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বাচ্চাদের তরবিয়ত করা আবশ্যক। আরএক্ষেত্রে মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা উচিত। শৈশব থেকেই শিশুদের সাথেমায়েরা বন্ধুত্ব করুন। তাদের ধমীয় শিক্ষা নিশ্চিত করুন। মায়েদের কাজ হল, তারা যেন নিশ্চিতরূপে দুনিয়ার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি বাচ্চাদের মস্তিষ্কেপ্রোথিত করে দেয়। পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্যআর জাগতিক কামনা-বাসনা যেনতাদেরকে গ্রাস করে না নেয়। বরংসবসময় যেন ধর্মকে প্রাধান্য দেয়। যখনকেউ ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করে,আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাকরে, সঠিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে,আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনেরচেষ্টা করে, উন্নত চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করে এবং ইসলামের শিক্ষার ওপর আমলকরার চেষ্টা করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।যখন মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে,তখন পৃথিবী তার দাসে পরিণত হবে। অতএব, শৈশব থেকেই এ বিষয়ে তরবিয়ত করা জরুরী। যদি আপনারা শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের উত্তম তরবিয়ত করার চেষ্টা করেন এবংভবিষ্যত প্রজন্মের তরবিয়ত নিশ্চিত করতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আপনারা সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। আরএটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এইছোট-খাট চ্যালেঞ্জ যা পরিস্থিতির কারণেতৈরি হয় তাকে আপনারা কোনভাবেইচ্যালেঞ্জ মনে করবেন না। প্রকৃত চ্যালেঞ্জহল, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া অনৈতিকতা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি। আপনারা যখন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন তখন আপনাদের পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট সকল বিপদ থেকে আপনারা নিরাপদ থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন: হুযূর! আরব নারীদের জন্যআপনার নির্দেশনা কী?

প্রিয় হুযূর (আই.): আরব হোক অথবা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নারীহোক, সকল আহ্মদী নারীর জন্যনির্দেশনা হল- প্রথমতঃ আপনাদেরসর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করতে হবে- যাসমাজে আপনাদের পরিচয় তৈরি করবে।যাতে মানুষ বুঝতে পারে, এই হল আহ্মদী নারীরা; যাদের কর্ম, চরিত্র উঠাবসা, কথাবার্তা, সমাজে চলাফেরাইসলামী শিক্ষাসম্মত। দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেভাবে আগে বলেছি আহ্মদী নারীদের নিজ সন্তানদের তরবিয়তনিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে ধর্মশিখান এবং তাদের জন্য দোয়া করুন।কেননা সন্তানদের জন্য পিতামাতার দোয়াঅধিক কার্যকরী। অতএব, তাদেরতরবিয়ত করার সাথে সাথে, তাদেরকে ধর্ম শিখানোর মাধ্যমে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত রাখার সাথেসাথে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী উচ্চমানেরনৈতিক শিক্ষা শিখানোর পাশাপাশিতাদের জন্য দোয়া করুন যাতে আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে সর্বদা ধর্মের সাথেসম্পৃক্ত রাখেন। তারা যেন কখনো বিপথেচলে না যায় এবং সর্বদা সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হয়। তাই বারবার "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"-এর দোয়া করুন।আর দোয়া করুন তারা যেন কখনোশয়তানী আক্রমণের শিকার না হয়।কখনো তাদের হৃদয়ে যেন ধর্মের সম্পর্কেসন্দেহ না জাগে। তাদের হৃদয়ে যেন কখনো সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির চিন্তারউদ্রেক না হয়। সকল আহ্মদী নারীর এভাবে নিজের সন্তানদের তরবিয়ত করা উচিত। এটি আহ্মদী নারীর ওপর মহান এক দায়িত্ব। যদি আহ্মদী নারীরা এইদায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করে তবে মহানবী (সা.)-এর এই বাণী সত্যায়ন হবে যে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।" অতএব, যদি নিজেরা জান্নাতে যেতে চান এবং বাচ্চাদেরও নিতে চান, তাহলে অবশ্যকরণীয় হল,পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করুনএবং তাদের উত্তমরূপে তরবিয়ত করুন।

প্রশ্ন: হুযূর, হিজাব পরিধান করারজন্য মহিলাদের সাথে যে সন্দেহমূলক আচরণ করা হয় সে বিষয়ে আমাদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত?

প্রিয় হুযূর (আই.): মূল বিষয় হল,হিজাব পরিধান করাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে শুধুমাত্র আপনাদের দেশেই নয়বরং ইউরোপেও এটিকে নেতিবাচকদৃষ্টিতে দেখা হয়। ইউরোপের কিছু এমনদেশ রয়েছে যেখানে হিজাব পরিধান করার বিরুদ্ধে আইন পাস করা হয়েছে।অথবা জনসম্মুখে হিজাব পরিধান করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শুধুমাত্র আইন নয়বরং জরিমানা এবং শাস্তির ব্যবস্থাওআছে। এত কঠোরতা সত্ত্বেও আহ্মদীনারী ও যুবতীরা হিজাব পরিধান করে।তাই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, হয়আপনাকে আল্লাহ্র কথা মান্য করতেহবে এবং আল্লাহ্র পথে সকল কষ্ট,হাসি-তামাশা এবং সকল কঠিনপরিস্থিতি সহ্য করতে হবে নতুবা ভয়পেয়ে মানুষের কথা মানবেন এবংসমাজের প্রথাকে অবলম্বন করবেন।অতএব, এই দুটির মাঝে একটি সিদ্ধান্তআপনাকে নিতে হবে। কিন্তু মু'মিননারীর ঈমান দৃঢ় হওয়া উচিত। যখনকেউ বিশ্বাস করে কুরআনের শিক্ষাসার্বজনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত,যখন কেউ বিশ্বাস করে কুরআন শেষশরীয়ত আর কুরআনে বর্ণিতআদেশ-নিষেধ আমাদের জন্য শিরোধার্যএবং আমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য,তাহলে মনে রাখতে হবে, কুরআননারীদের পর্দা করার আদেশ দেয়। তাইএই আদেশ পালন করুন। তাই হয়আপনাদের নিজের ঈমানের সুরক্ষা এবংআল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনেরসিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুবা সমাজকে ভয়পেয়ে সমালোচনায় চিন্তিত হয়েইসলামের শিক্ষাকে পরিত্যাগ করতেহবে। এখন এটি আপনাদের বিষয়,আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন্পথ অবলম্বন করবেন? আমার বিশ্বাসআহ্মদী নারী ও যুবতীরা এই সিদ্ধান্তেসুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, যেহেতু আমরামসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কেমান্য করেছি, তাই আমাদের কুরআনেরআদেশ-নিষেধ এবং যে শিক্ষা পুনর্জীবিত করার জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন তা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন: আমরা কি অ-আহ্মদী বন্ধুদের এমন দাওয়াতে বা অনুষ্ঠানে যেতে পারি যেখানে ইসলামের শিক্ষা পরিপন্থি প্রথাপ্রচলিত থাকে?

প্রিয় হুযূর (আই.): মূল বিষয় হল,শুধুমাত্র কাবাবির কিংবা ইসরাইলে এই অবস্থা না বরং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেএকই অবস্থা বরং মুসলমান দেশগুলোতেও একই অবস্থা। বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে হিন্দু বা অমুসলিমদের প্রথা এত শক্তভাবেপ্রচলিত যে, মুসলমানদের মাঝেও এই প্রথা প্রচলিত হয়ে গেছে। যদিঅ-আহ্মদী বন্ধুরা আপনাদের ডাকে তখন নিঃসন্দেহে যাবেন কিন্তু তাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায়রাখুন। যদি সেখানে নাচ-গান হয় তাহলেসেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিন। অথবাযদি সেখানে কোন অনৈতিক অনুষ্ঠানচলে তাহলে উঠে অন্যদিকে চলে যান।তবে সাধারণত এই রকম অবস্থা হয় না।যদি চরম পর্যায়ের কোন নোংরা পরিস্থিতি হয় তাহলে ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যদি কেউ দাওয়াত দেয় তাহলে সেখানে যাবেন।যেমন, যদি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, তাহলেবিয়েতে যান এবং বিয়েতে উপহার দিন।এরপর খাবার খেয়ে ফেরত আসুন।এভাবে আপনি নোংরামি থেকে নিজেকেবাঁচাতে পারেন। তেমন কোন সমস্যাহওয়ার কথা না। কিন্তু একদম অনৈতিকপরিস্থিতির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। আর পরিবেশ যদি বেশি অনৈতিক হয় তাহলেআগেই বুঝা যায়। তখন এমন অনুষ্ঠানেযাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সাধারণত এসবঅনুষ্ঠানে নিজেদের নোংরামি থেকেবাঁচানোর মত অবস্থা থাকে। অতএব যদিকেউ দাওয়াত দেয় তাহলে সবার যাওয়াউচিত কেননা এতে পারস্পরিক সম্পর্কতৈরি হয়, সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং তবলীগের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আপনি যদি তার থেকেনিজেকে আলাদা করে রাখেন তাহলে তবলীগের পথ আরো সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

তাই সবার উচিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি পরিবেশ চূড়ান্তপর্যায়ের নোংরা হয় তাহলে অবশ্যইএগুলো পরিহার করতে হবে। কিন্তুসাধারণত এত নোংরা পরিবেশ হয় না।এসব দাওয়াতে প্রথাগত বিভিন্ন অনুষ্ঠানহয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে এইসব অযথাজিনিসকে না দেখে এক পাশে বসুন।কিন্তু যদি কোন মেয়ে নাচে তাহলেআপনারা দেখতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনসমস্যা নেই। কিন্তু যদি নারী-পুরুষএকসাথে থাকে সেখানে মাঝে মাঝে কোন কোন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 11 Nov, 2021 Issue No.46

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অনৈতিক কাজ বা ভুল সংঘটিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রেনিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখা উচিত। কিন্তু যদি শুধুমাত্র মেয়েরাই থাকে আর তারানাচ গান করে, তাহলে আপনাদের দেখায়কোন সমস্যা নেই। এতটা কঠোর হওয়ার কোন দরকার নেই। তখন আপনি আপনার বান্ধবীদের সাথে কথাও বলতে পারেন। আপনাদের তো আর কেউ নাচতে বলছে না। আপনাকে জোর করে কেউ নাচতে বলবে না। আর যদি কেউ জোর করে তাহলে তাদের বলুন যে,আমার এই নাচে অংশ নেয়া সম্ভব না। কেননা আমার ধর্ম এর অনুমতি দেয় না।আর এটি একদিকে আপনার বিশ্বাসের তবলীগের কারণও হয়ে যাবে। যদি কেউবলে যে, আসো আমাদের সাথে নাচেঅংশ নাও। তাহলে তাদের বলুন যে, নাআমি নাচতে পারবো না, কেননা আমার ধর্ম এর অনুমতি দেয় না। তখন ধর্মেরবিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। তাদেরমাঝে কোন না কোন পুণ্যপ্রকৃতির মানুষথাকবে যে আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আর এভাবে তবলীগের নতুনদ্বার উন্মুক্ত হবে। কিন্তু নিজেকে সমাজ থেকে একদম আলাদা করে নিবেন না।হ্যাঁ! যদি কোন ধরনের অনৈতিক পরিবেশ থাকে, তাহলে সেই সভা বা অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা উচিত। এরকম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা উচিত। আসলে এটি আপনাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। আপনার বিশ্বাস যত দৃঢ় হবে তত এই সমাজের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবেন।

প্রশ্ন: কুরআনে বলা আছে, পুরুষ মহিলাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক। এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি? এই আয়াতের অর্থ কি এটা যে, নারী তার নিজের মতামতের ওপর পুরুষের মতামতকে প্রাধান্য দিবে?

প্রিয় হুযূর (আই.): এই আয়াতের অর্থ কখনই এটি নয় যে, পুরুষের মতামত নারীর ওপর প্রাধান্য পাবে। নারীরাও অনেক প্রজ্ঞার কথা বলে, মাশাআল্লাহ্। নারীদের পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর যুগে অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন সকল পুরুষের মতামত অগ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তখন উম্মে সালামা (রা.)-এর মতামত অনুযায়ী মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর যেসব সাহাবা ত্যাগস্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তারা দ্রুত ত্যাগস্বীকার করেন। মহানবী (সা.) নারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের মতামতকে সম্মান করেছেন। একদা মহানবী (সা.) কোন মজলিসে বসেছিলেন। একজন নারী সাহাবা এসে বললেন, পুরুষরা জিহাদও বেশি করে, আর্থিক কুরবানী বেশি বেশি করে, সকল পুণ্যকর্ম বেশি বেশি করে। আমরাও ইবাদত করি,কিন্তু পুরুষের মত জিহাদ বা অন্যান্য পুণ্যকর্ম যা তারা বাইরে করে যার কারণে তারা শাহাদাতের মত উচ্চ মর্যাদা লাভ করে কিন্তু আমরা এমন সুযোগ পাই না।আমরা কীভাবে এই পুণ্যকর্মে অংশ নিতে পারি? মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন; এমন কেউ আছে যে, এই নারীর থেকে উত্তম রূপে নারীদের স্বার্থে কথা বলতে পারে? অর্থাৎ মহানবী (সা.) তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতএব, পুরুষ সর্বদা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে; তাই সবসময় তার কথা মানা উচিত- এটি বলা ঠিক নয়। এই আয়াতের অর্থ হল, পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব হল, সে যেন পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে এবং নিজ ঘরের পরিবেশ যেন ইসলামী শিক্ষাসম্মত রাখে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যদি নারী আয় করে তাহলে পুরুষ যেন পরিবারের খরচ চালাতে নারীর কাছে অর্থ না চায়। যদি নারী সংসারের খরচ চালাতে ইচ্ছুক না হয় সেই নারী কোন আয় করুক বা না করুক পুরুষের দায়িত্ব হল, পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার দায়িত্ব হল, সে তার ঘরের পরিবেশ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী বজায় রাখবে যাতে সবার উত্তম তরবিয়ত নিশ্চিত হয়। অনেক ঘরে ঝগড়া হয়, যাদের ঝগড়া হয় তাদেরকে আমি এই উদাহরণ দিয়ে থাকি যে, পুরুষ নারীর ওপর তত্ত্বাবধায়ক এই আয়াতের একটি অর্থ হল; যদি নারী-পুরুষের মাঝে ঝগড়া হয় তাহলে যেহেতু পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক আর সে শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তাই তার উচিত সে যেন ধৈর্যধারণ করে। আর অকারণে নারীদের সাথে ঝগড়া না করে। ছোট-খাট বিষয় সহ্য করুন এবং মেনে নিন। যাতে ঘরের পরিবেশ সবসময় শান্তিপূর্ণ থাকে। এটি হল 'কাওয়ামুন' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা। যেন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অপেক্ষাকৃত বেশি শারীরিক শক্তির কারণে নিজে চুপ থাকে এবং ঘরের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখে। যাতে বাচ্চাদের সঠিক তরবিয়ত নিশ্চিত হয়। পুরুষকে অধিকার প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে যে, তুমি অবশ্যই নারী ও সন্তানদের অধিকার আদায় কর। এটাই হল তোমার তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার যথার্থতা।

হুযূর (আই.) রসিকতা করে বলেন, এখন গিয়ে আপনারা নিঃসন্দেহে নিজের স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন! ... (চলবে)

১ম পাতার শেষাংশ...

বহিঃপ্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, এটি কুরআনে আযীম=এর অংশ, এর বাইরের নয়। এই অর্থ দ্বারা সেই সব মানুষের চিন্তাধারা খণ্ডন হয় যাদের ধারণা, সূরা ফাতিহা কুরআন করীমের অংশ নয়। হাদীসেও সূরা ফাতিহার নাম কুরআনে আযীম বলা হয়েছে। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন-'অর্থাৎ সূরা ফাতিহা উম্মুল কুরআন এবং সেই সঙ্গে সাবা মাসানি এবং কুরআন আযীমও বটে। হাদীসটি অর্থ এই নয় যে, কুরআন আযীম সমগ্র কুরআনের নাম নয়। দুটি অর্থই একত্রে করা যেতে পারে। কেননা অর্থের ভিন্নতা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা কারণে। আর দুটি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সঠিক। যদি কুরআনে আযীম-এর অর্থ সমগ্র কুরআন করা হয়, তবে এর অর্থ হবে আমরা তোমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহাও দান করেছি। আর এছাড়াও একটি কুরআন দিয়েছি যার মধ্যে সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এর শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও। আর সেই সব লোকেদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ভাবনা মনে স্থান দিও না। এখন মুসলমানদেরকে কুরআন করীমের অর্থ গুরুত্বসহকারে শেখানোর সময় হয়েছে, যাতে তারা নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার যোগ্য হয়ে ওঠে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১১০)

মজলিস আনসারুল্লাহ্ কান্দি জোনের ১৪ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। স্থান: ইব্রাহিমপুর

গত ২৩ ও ২৪ শে অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ইব্রাহিমপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে মজলিস আনসারুল্লাহ্র কান্দি জোন (মুর্শিদাবাদ) -এর ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল। কান্দি জোনের আমীর সাহেব মাননীয় আশরাফুর সেখ সাহেবের সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ প্রভৃতি জ্ঞানমূলক ও ক্রীড়া- প্রতিযোগিতায় আনসারগণ পূণ্য উদ্যম ও উৎসাহসহকারে অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ বিভাগের মুবাল্লিগ মাননীয় জুলফিকার আলি সাহেব।

করোনা পরিস্থিতির বিধিনিষেধ শিরোধার্য করে এই অনাড়ম্বরপূর্ণ ইজতেমায় উপস্থিতির সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। তথাপি ইজতেমায় মোট অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল ৭২ জন। আল্লাহ্ তা'লা করুন এই ইজতেমা জামাতের জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনুক এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে নিজ সন্নিধান থেকে প্রতিদান দিন। আমীন।

সংবাদদাতা: কাযি তারিক আহমেদ, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ)

সন্তান লাভ

বাঁশড়া জামাতের সদস্যা ও সদর লাজনা মাননীয়া ফাতিমা বেগম সাহেবার কন্যা শাহনায সুলতান (এবং উমর ফারুক সাহেব) কে আল্লাহ্ তা'লা গত ১৪-৮-২১ তারিখে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। আলহামদোলিল্লাহ্। মেয়ের নাম রাখা হয়েছে '**ইনসিয়া সাদিক**'। সদ্যজাতের দীর্ঘায়ু, সুখ ও সমৃদ্ধময় ভবিষ্যত এবং জামাতের জন্য এক কল্যাণকর সত্তা হওয়ার জন্য জামাতের সদস্যদের কাছে বিশেষ দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

সংবাদ দাতা: ফাতিমা বেগম, জামাত আহমদীয়া বাঁশড়া। দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir